Modern Japanese Stories
Translated by Kanti Chattopadhyay

Courtsey
Charles E. Tuttle Company
Japan

Woodcuts
Masakazu Kuwata

প্রথম সংস্করণ (১১০০)
২৫শে ফেব্রুয়ারী ১৯৫৯
প্রচ্ছদ : স্বপন রুদ্র
অনুবাদ স্বত্ব : কান্তি চট্টোপাধ্যায়

প্রকাশিকা : মনীষা ভট্টাচার্য। অন্বেষা
৮৯ এ, এন কে ঘোষাল রোড, কলকাতা ৪২

মুদ্রক : গোপালচন্দ্র পাল, স্টার প্রিন্টিং প্রেস
২১এ রাধানাথ বোস লেন, কলকাতা ৬

মুখবন্ধ

আধুনিক জাপানী গদ্য সাহিত্যের বয়স একশ বছরের থেকে খুব বেশী নয়। জাপানের ইতিহাসে মেইজি পুনরুদ্ধারের সূচনা হয় 1867 সালে। দেশের শাসন ব্যবস্থায়, রাজনীতিতে শিক্ষা ব্যবস্থায় এবং আরো নানান ক্ষেত্রে পিছনের আড়াইশ বছরের সামন্ততান্ত্রিক আবিলতার জায়গায় আধুনিকতার শুরু তখন থেকেই। সম্রাট মেইজির সার্বভৌম নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে যোগাযোগ দিন দিন বাড়তে থাকে। পাশ্চাত্য ভাবধারায় দেশকে গড়ে তোলার সংকল্পে সম্রাট মেইজি এবং তার উপদেষ্টারা বিজ্ঞান, বাণিজ্য, দর্শন, রাজনীতি এবং সাহিত্যের ক্ষেত্রে পাশ্চাত্য উপলব্ধির অনুপ্রবেশ এবং অনুকরণ অবাধ করতে যত্নবান হন।

1880 সাল নাগাত শুরু হয় ইয়োরোপের মহৎ সাহিত্যকৃতির ব্যাপক অনুবাদ। টলস্টয়, ডস্টোয়েভস্কি, টুর্গেনেভের রচনার সঙ্গে নব্য জাপানের সাহিত্যস্রষ্টা ছিলেন ৎসুবাউচি শোইয়ো (Tsubouchi Shoyo)। ইংরেজী সাহিত্যে ছিল তাঁর প্রগাঢ় প্রীতি এবং বিশেষজ্ঞের জ্ঞান। শেক্সপীয়রের সমগ্র রচনা স্বভাষায় অনুবাদ তাঁর মহৎ কীর্তি। 1885 সালে প্রকাশিত হয় তাঁর The Essence of the Novel (শোসেৎসু য়িনজুই)। আধুনিক জাপানী কথা সাহিত্যের প্রথম তাত্ত্বিক সমালোচনা ও মূল্যায়ন।

মেইজি সাহিত্যের অপর এক দিকপাল ছিলেন মোরি ওগাই যাঁর "ভাঙা-গড়া" দিয়ে এই সংকলনের শুরু। মেইজি যুগের অন্যান্য লেখকেরা পাশ্চাত্য ঢঙে জাপানী ভাষায় গদ্য সাহিত্যকে ঢেলে সাজাতে গিয়ে অনুবাদ সাহিত্যের ওপর নির্ভরশীল ছিলেন, পাশ্চাত্য রীতি ও ভাবাদর্শ জাপানী মৃত্তিকায় রোপণের ব্যাপারে। কিন্তু মোরি ওগাই-এর ছিল ইয়োরোপীয় সাহিত্য ও জীবনধারার সঙ্গে সরাসরি নিবিড় যোগ।

মেইজি সাহিত্য বিশেষভাবে প্রভাবিত ছিল বালজাক, ফ্লবেয়ার ও মপাসাঁর রচনার দ্বারা। মেইজি লেখকের গদ্য রচনায় স্বাভাবিকতা বা জীবনকে

নিরলঙ্কার প্রতিবেদন রূপে উপস্থাপিত করার প্রয়োজন উপলব্ধি করেন। এই কাজে আত্মসমালোচনা এবং স্বীকারোক্তির আঙ্গিক উপযোগী বলে এঁদের মনে হয়। তাই, লেখকের নিজের অনুভবের বাস্তবানুগ বিবরণ উত্তম পুরুষেই ব্যক্ত হতে লাগল। এইভাবে "শি-শোসেৎসু" বা 'আমি উপন্যাস' একটা সহজ ও জনপ্রিয় গদ্য রীতি হয়ে উঠল।

বাস্তব সর্বক্ষেত্রেই কঠোর এবং তাকে প্রকাশ করতে গিয়ে যদি নিজেকে জড়াতে হয় তাহলে লেখকের মর্মে অনুভূত আদর্শের ন্যূনতা তাঁর রচনায় প্রতিফলিত হতে বাধ্য। তাই "শি-শোসেৎসু" রচনার বাস্তবতা বা স্বাভাবিকতা স্বাভাবিকভাবেই মুখ্যত নৈরাশ্যবাদী। এদিকে, মেইজি পুণরুদ্ধারের পর থেকে শিল্প, বাণিজ্য, সমরসজ্জা ও অর্থনীতিতে জাপান উত্তরোত্তর অগ্রসর হয়ে চলেছে। যার পরিণতি রুশ জাপান যুদ্ধের সাফল্যই জাপানকে উগ্র জাতীয়তাবাদে উদ্বুদ্ধ করে তোলে। মেইজি নৈরাশ্যবাদের জায়গা নেয় অনেকগুলি নতুন সাহিত্য ভাবনা যেমন আদর্শবাদ, অতীন্দ্রিয় কল্পনাপ্রধান একাধিক রোমান্টিকবাদ, আদর্শানুসারী মানবতাবাদ প্রভৃতি। এই যুগেই রচিত হয়েছে জাপানের শ্রেষ্ঠ গদ্য সাহিত্য। শিগা নাওইয়াকে এই যুগের একজন প্রতিনিধি বলা চলে। মেইজি পুণরুদ্ধারের গদ্যসাহিত্য জাপানে অপাঙক্তেয় ছিল। গদ্য ছিল শিশু, নারী এবং অল্প শিক্ষিতের ভাব প্রকাশের বাহন। শিগা নাওইয়াতে এসে সেই গদ্যে আসে হীরের ধার ও দ্যুতি।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জাপান ছিল মিত্র পক্ষে। সামন্ততান্ত্রিক জঙ্গী শাসনের জায়গা নিয়েছিল জাতীয়তাবাদী রাজতন্ত্র যার কাঠামো ছিল ধনতান্ত্রিক। দ্রুত শিল্পায়ন ও বহির্বাণিজ্যে অগ্রগতি যত হয়েছে অর্থনৈতিক বৈষম্যও তত বেড়েছে। কৃষি নির্ভর যৌথ-পরিবার-ভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থা কায়েম হয়েছে। ধনতান্ত্রিক কাঠামোয় রাজন্য এবং জঙ্গী আমলাতন্ত্রের ছত্রছায়ায় সম্পদের অসম বন্টন অনিবার্যভাবে ডেকে আনে মুদ্রাস্ফীতি। রুশ বিপ্লবের ফলে শোষণ-হীন সাম্যবাজী ব্যবস্থার সাফল্য একদিকে যেমন চিন্তশীল বুদ্ধিজীবীকে

প্রেরণা জোগায় তেমনি অপর দিকে 1923 সালের বিধ্বংসী ভূমিকম্প সাধারণ মানুষকে টেকে আনে অপরিসীম দুর্দশায়। এই সময় থেকে সূচনা হয় প্রলেতারিয় সাহিত্য আন্দোলন। এদিকে শাসকবর্গও ক্রমশ কঠোর দমন নীতিতে এবং ফ্যাসীবাদে বিশ্বাসী হয়ে উঠে। তাই কমুনিজমে আস্থাবান বহু লেখক লেখিকার কাছে সাহিত্য সৃজনের সঙ্গে কারাবাস অপরিহার্য হয়ে ওঠে। 1925—40 এর মধ্যে প্রগতিশীল সাম্যবাদী রচনা বহুলভাবে জাপানের সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করে তোলে। তবে এই সব রচনার অনেকাংশই কালবাধিত হয়ে যায়।

আবার, প্রলেতারিয় রচনার প্রতিক্রিয়া হিসেবে প্রাচীন ক্লাসিক কাব্য সাহিত্য এবং চীনা সাহিত্যের পঠন পাঠনে অনেকে আকৃষ্ট হন এবং নব্য-ক্লাসিক ধারা নিয়েও পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু হয়। নাকাজিমাতন এবং মিশিমা ইয়ুকিও এই নব্যধারার পুরোহিত।

যুদ্ধোত্তর কালে আমেরিকান তাঁবেদারীর অবসানের পরে জাপানের অর্থ-নৈতিক সমৃদ্ধি উত্তরোত্তর বেড়ে চলেছে। রং চঙে পত্র পত্রিকার প্রসার হয়েছে সমানতালে। কথা সাহিত্য আজ সম্পূর্ণ অবাধ, নিয়ন্ত্রণহীন। সমাজ জীবনেও পারিবারিক বন্ধন শিথিল হতে হতে আজ শিকড়বিহীন, নিরালম্ব। তাই এ সময়ের সাহিত্যে যৌনতা বেশী প্রকট হয়েছে। সাংবাদিকতা ও লঘু বিনোদন এক যোগে চালিয়ে আজকের জাপানী লেখক আর্থিক সচ্ছলতা পেয়েছেন, জনপ্রিয় হয়েছেন। তবে কালজয়ী সৃষ্টিকর্মে নিবিষ্ট হবার সময় ও মেজাজ তাঁদের নেই।

এই সংকলনের আটটি গল্প শেষোক্ত যুগকে স্পর্শ করেনি। অনুবাদ মূল থেকে নয়। লেখক পরিচিতি এবং আধুনিক জাপানী সাহিত্য সম্বন্ধে উপরের মন্তব্যও ইংরেজি ভাষায় আলোচনা থেকে নেওয়া।

কান্তি চট্টোপাধ্যায়

আধুনিক জাপানের গল্প

সূচিপত্র

ভাঙা-গড়া   মোরি ওগাই

ট্রাম থেকে কাবুকি নাট্যশালার সামনে ওয়াতানাবে নেমে পড়লেন। বৃষ্টিটা থেমেছে। পথের ধারে ধারে জমে থাকা জলের ছোট ছোট আবর্ত-গুলি সাবধানে এড়িয়ে ওয়াতানাবে এগোচ্ছিলেন কোবিকি অঞ্চলটার ভেতর দিয়ে যোগাযোগ দপ্তরের দিকে। খালের ধার দিয়ে যেতে যেতে ওঁর মনে হয় রেস্তোরাঁটা এখানেই কোথাও হবে। সাইনবোর্ডটা যেন দেখেছিলেন এখানেই একটা বাঁকের মুখে।

রাস্তা প্রায় ফাঁকা। সরবে কথা বলতে বলতে চলেছে একদল যুবক পরণে তাদের পশ্চিমী পোশাক। ওদের বোধহয় অফিসের ছুটী হয়েছে। একটি মেয়ে প্রায় ওঁর গায়ের ওপর এসে পড়ে। তার পরণে কিমোনো। কোমরবন্দটার উজ্জ্বল রং। বোধহয় কাছাকাছি চায়ের দোকানের ওয়েট্রেস। একটা রিকশ ওঁকে পেরিয়ে গেল। হুডটা খোলা।

অবশেষে নজরে পড়ল ছোট সাইন বোর্ডটা—লেখাটা পশ্চিমী—কেতায় বাঁদিক থেকে ডান দিকে ঃ "সেইওকেন হোটেল"। খালের মুখোমুখি বাড়িটার সামনেটায় একটা ভারা বাঁধা রয়েছে। প্রবেশ পথ এখন পাশের একটা গলি দিয়ে। বাড়িটার বাইরে দিয়ে দু'ধারে দু'সারি সিঁড়ি উঠে গেছে মাথা কাটা ত্রিভুজের আকৃতি দিয়েছে বাড়ির সামনেটাকে। সিঁড়ির শেষে একটা করে কাচের দরজা। একটু ইতস্তত করে ওয়াতানাবে বাঁদিকের দরজাটা ঠেলে ঢুকলেন, দরজাটাতে লেখা ছিল "প্রবেশ"।

বেশ খানিকটা চওড়া পথ চলে গেছে খানিকদূর পর্যন্ত। দরজার এক ধারে রাখা আছে এক রাশ ছোট ছোট ঝাড়ন। জুতোর ধুলো মুছে নেবার জন্যে। তার পাশেই রয়েছে ঢাউস সাইজের একটা পাপোষ—পশ্চিমী কায়দা। বৃষ্টির জল কাদার মধ্যে দিয়ে চলার ফলে ওয়াতানাবের জুতো কাদায় মাখা মাখি। তাই দুটি উপকরণ দিয়েই সযত্নে জুতো পরিস্কার করে নেন। দেখা

যাচ্ছে এই রেস্তোরাঁয় পশ্চিমী আদব কায়দা মতো জুতো পরেই ভেতরে যাওয়ার বিধি।

পথটাতে জনমনিষ্যির সাড়া পাওয়া যায় না। দূর থেকে শোনা যাচ্ছে হাতুড়ি পেটার, করাত চালানোর শব্দাশব্দি। জায়গাটায় এখন চলছে'মেরামতির কাজকর্ম', ভাবলেন ওয়াতানাবে।

কিছুকাল অপেক্ষা করলেন। কিন্তু কই, কেউতো ওঁকে আহ্বান করে ভেতরে নিয়ে যেতে এল না। তাই পথটার শেষপ্রান্ত পর্যন্ত এগিয়ে যেতে হয়। নজরে পড়ে কয়েকগজ দূরে দেওয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে একটি লোক, হাতে একটা তোয়ালে। তার সামনে যেতে হয়।

'গতকাল আমি একটা রিজার্ভেশন চেয়ে টেলিফোন করেছিলাম।'

লোকটা সঙ্গে সঙ্গে তটস্থ। 'আজ্ঞে করেছিলেন বৈকি। দুজনের জন্যে একটা টেবিল তো? দোতলায় একটু কষ্ট করে উঠতে হবে। আসুন আমার সঙ্গে।' লোকটার পিছন পিছন তাই যেতে হয়।

আর এক প্রস্থ সিঁড়ি ভাঙতে হয় ওয়েটারের সঙ্গে। লোকটা ঠিক চিনতে পেরেছে কে আমি, ভাবলেন ওয়াতানাবে। বাড়ি সারানো চলছে তাই এখন বোধহয় খদ্দেরপাতির কম আসা যাওয়া। সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে হাতুড়ি পেটার আওয়াজে কানে তালা ধরে যায়।

'বেশ হৈ হট্টগোলের জায়গাতো', ওয়েটারের দিকে তাকিয়ে বললেন ওয়াতানাবে। 'আজ্ঞে ঠিক তা নয়। পাঁচটা বাজলেই এরা চলে যাবে। আপনাদের খাওয়ার সময় হট্টোগোল থাকবে না স্যার।'

সিঁড়ির শেষে ওয়েটার ওঁকে পেরিয়ে এগিয়ে যায়। বাঁ ধারের একটা দরজা খুলে দেয়। প্রশস্ত একটি কামরা, জানালা থেকে খালটা দেখা যায়। দু'জন লোকের পক্ষে একটু বেশি বড়। তিনটে ছোট ছোট টেবিলকে ঘিরে বসানো হয়েছে অনেকগুলো চেয়ার, মানে যতগুলো ধরানো যায়। জানালার ধারে মস্ত এক সোফা। তার পাশে টবে বসানো ফুট তিনেক লম্বা একটা

আঙুরলতা আর একটা বেঁটে করা বড় বড় থোলোর উষ্ণ ঘরের আঙুর।

ওয়েটার ঘরে ঢুকে আর একটা দরজা খুলে দেয়। "আজ্ঞে, এই কামরা-টাতে আপনাদের খাবার দেওয়া হবে।" ওয়াতানাবে ওকে অনুসরণ করে কামরাটায় ঢুকলেন। ছোট্ট ঘর, ঠিক দুজনের জন্যেই যেন তৈরি। ঠিক মাঝ-খানটিতে টেবিল পাতা হয়েছে—এলাহি আয়োজন। ডবল করে টেবিল কভার পাতা। ফুলের একটা সাজিতে গুচ্ছ গুচ্ছ আজেলিয়া আর রডোডেন্‌ড্রন।

মনে কিছুটা তৃপ্তির ভাব নিয়ে ওয়াতানাবে ফিরে আসেন বড় কামরাটায়। ওয়েটার চলে গেছে, এখন আবার একা। হাতুড়ির শব্দ হঠাৎ থেমে যায়। ঘড়ি দেখলেন, ঠিক পাঁচটা। এখনো আধঘন্টা অপেক্ষা করতে হবে। টেবিলের ওপরে খুলে রাখা বাকস থেকে একটি সিগার তুলে নিলেন। একটা প্রান্ত কেটে ধরালেন।

আশ্চর্যের কথা, কোন সম্ভাবনার অনুভূতি টের পাচ্ছেন না। যেন এই কামরায় কে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসছে সেটা কোন ব্যাপারই নয়। ওই ফুলের সাজিটার ওধারে কার সঙ্গে মুখোমুখি হবেন তাই নিয়ে ওঁর কোন আগ্রহই নেই। নিজের এই নির্লিপ্ত ভাবটা নিজের কাছেই অবাক লাগছে।

সিগারে মৌজ করে টান দিতে দিতে কয়েক পা এগিয়ে ধারে গিয়ে জানালাটা খুলে দিলেন। ঠিক নিচে সাজানো রয়েছে রাশি রাশি তক্তা। ওটাই প্রধান ফটক। খালের জল সম্পূর্ণ নিথর। অপর পারে নজরে পড়ে একসারি কাঠের বাড়িঘর। দেখে মনে হয় এগুলো সব কোয়ার্টার। পিঠে বাচ্চা বাঁধা একটি স্ত্রীলোককে দেখা যায় একটা বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসছে। এছাড়া আর কোন মানুষজনকে দেখতে পাওয়া যায় না। একেবারে ডানদিকে নৌবাহিনীর সংগ্রহশালাটা দৃষ্টিকে আড়াল করে দাঁড়িয়ে আছে। লাল ইট দিয়ে তৈরি তার বিশাল আকৃতি নিয়ে। সোফায় বসে ওয়াতানাবে কামরাটা খুঁটিয়ে দেখতে নিবিষ্ট হন। দেওয়ালগুলোর অলঙ্করণ করা হয়েছে সংগতি-হীন কতকগুলি চিত্র দিয়ে—যেমন তালগাছে নাইটিঙ্গেল এর পাশে রূপকথা থেকে কোন অংশ। আবার তার পাশে হয়ত একটা বাজপাখি। পটচিত্রগুলি

সরু সরু, আকারে ছোট। উঁচু দেওয়ালে আবার তাদের দেখাচ্ছিল যেন বেঁটে, তলার অংশটা বুঝি গুটিয়ে রাখা কিংবা চাপা দিয়ে লুকানো আছে। দরজার মাথার ওপর বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ থেকে খানিকটা উদ্ধৃতি বড় একটা ফ্রেমে বাঁধিয়ে রাখা। আর এই দেশই নাকি চারু কলার দেশ, ওয়াতানাবে ভাবছিলেন।

কিছুক্ষণ বসে বসে ধূমপানই চলল। শারীরগত ও স্বচ্ছলতার অনুভূতিই হল বিনোদনের বিষয়। তারপরই বারান্দা থেকে কথাবার্তার শব্দ শোনা যায়। দরজাটা খুলে যায়। হ্যাঁ, ও এসেছে।

ওর মাথায় বড় সাইজের একটা আন-মেরী ঘাসের টুপী—পুঁতি দিয়ে সাজানো। দীর্ঘ ছাই রঙের কোটের তলায় সাদা এমব্রয়ডারি করা বাতিস্ত ব্লাউজ। ট্যাসেল ঝোলানো বেঁটে ছাতা হাতে। ওয়াতানাবে মুখে একটু হাসি টেনে আনলেন। সিগারটা ফেলে দিয়ে সোফা ছেড়ে উনি উঠে দাঁড়ালেন।

জার্মান মহিলা ওড়না সরিয়ে ওয়েটারের দিকে তাকালো। ওয়েটার তার সঙ্গে এই কামরা পর্যন্ত এসেছিল। এখন দরজার ধারে দাঁড়িয়ে আছে। ওর দৃষ্টি এবার ফিরল ওয়াতানাবের দিকে। বড়ো বড়ো খয়েরী চোখ—যেমন থাকে কৃষ্ণকেশীদের। অতীতে বহুকাল ধরে এই চোখের গভীরে দৃষ্টি মেলে ছেন ওয়াতানাবে। কিন্তু কই চোখের কোলে ওই ধূসর ছায়া তো সেই বার্লিনের দিনগুলোতে দেখেননি।

'তোমাকে বসিয়ে রেখেছি বলে দুঃখিত,' জার্মান ভাষায় আচমকা কথাগুলো বলে মেয়েটি। ছাতাটা ডান হাত থেকে বাঁ হাতে নিয়ে আড়ষ্টভাবে গ্লাভ পরা ডানহাতটা বাড়িয়ে দিল। এর সবটাই ওয়েটারকে দেখিয়ে, ভাবলেন ওয়াতানাবে। অত্যন্ত শিষ্ট ভঙ্গীতে তিনি হাতখানি নিলেন নিজের হাতে।

'খাবার তৈরি হলে আমাদের বোলো', দরজার দিকে ফিরে উনি বললেন। ওয়েটার মাথা নুইয়ে কামরা ছেড়ে চলে যায়।

'তোমাকে দেখে ভারি খুশি হয়েছি', জার্মান ভাষায় বললেন ওয়াতানাবে। মহিলা ছাতাটা নিরুদ্বেগে একখানা চেয়ারের ওপর রেখে সোফার ওপর বসল, ক্লান্তির একটা দীর্ঘশ্বাসের আভাস টের পাওয়া গেল। টেবিলের ওপর

কনুই দুটো রেখে সে তাকিয়ে রইল ওয়াতানাবের দিকে কোন কথা না বলে। টেবিল সংলগ্ন চেয়ার টেনে ওয়াতানাবে বসলেন।

'জায়গটা বেশ নিরিবিলি, তাই নয় কি।' সে বলল খানিক বাদে।

'এখন ভাঙাগড়া চলছে', বললেন ওয়াতানাবে। 'আমি যখন এলাম তখন যা আওয়াজ হচ্ছিল।'

'ও তাই বলো। তাই বুঝি মনটা থেকে থেকে এমন অস্থির হয়ে উঠছে। অবশ্য এমনিতেই আমি খুব একটা শান্ত মন নিয়ে থাকতে পারি না।'

'তুমি জাপানে কবে এসে পৌঁছেচ ?'

'গত পরশু। তারপর গতকালই তোমাকে দেখতে পেলাম রাস্তায়।'

'কেন এলে ?'

'ব্যাপার কি জান ? গত বছরের শেষাশেষি থেকে আমি রয়েছি ভলাদি-ভসটক-এ।'

'নিশ্চয় সেই হোটেলটাতে গান গাইছ, কী যেন নাম ?'

'হ্যাঁ।'

'আর তুমি একলাও নও নিশ্চয় ? কোন দলের সঙ্গে এসেছে তো ?'

'কোন দলের সঙ্গে নয়। তবে একাও নয়। আমার সঙ্গে ছিলেন একজন পুরুষ সঙ্গী। তাকে তুমিও চেন।' মেয়েটি ইতস্তত করে। 'আমার সঙ্গে ছিল কোসিনস্কি।'

'ও, সেই পোলিশ ছোকরা। তার মানে এখন তোমাকে ডাকতে হবে কোসিনস্কায়া বলে ?'

'কি যা তা বলছ ! আমি গান গাই আর কোসিনস্কি শুধু সঙ্গত করে।'

'কেবল এইটুকু ? ঠিক তো ?'

'কী জানতে চাও ? আমরা দুজনে মিলে ফুর্তি টুর্তি করছি কিনা ? তা কখনো সেরকম ঘটেনা এ কথাই বা বলি কি করে ?'

'আশ্চর্য কি ? টোকিওতেও সে তোমার সঙ্গে এসেছে তো ?'

'হ্যাঁ ! আমরা দুজনে এখন রয়েছি আইকোকুসান হোটেলে।'

'তা সে যে তোমায় একলা আসতে দিল ?'

'বন্ধু, আমি শুধু তাকে আমার গানের সঙ্গে সঙ্গত করতে দিই, বুঝলে ?'

"বেগলেইটেন" শব্দটা সে ব্যবহার করলো। ওয়াতানাবে ভাবলেন শুধু পিয়ানোতে নয় আরো নানাভাবে সঙ্গ দিয়ে থাকে নিশ্চয়।

'আমি ওকে বললাম যে গিনজাতে তোমার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে। তোমার সঙ্গে দেখা করতে ওর খুব ইচ্ছে।'

'সেই সুখ থেকে বঞ্চিত করতে আশা করি তুমি আমাকে দেবে ?'

'ভয় নেই। ওর এখন পয়সার টানাটানি বা আর কোন অভাব নেই।'

'নেই। তবে এখানে বেশিদিন থাকলে অভাব হতে দেরি হবে না', ওয়াতানাবে বললেন একটু হেসে। 'তা, এরপর কোথায় যাবে বলে ঠিক করেছ ?'

'আমি যাচ্ছি আমেরিকা। সবাই বলছে জাপানে থেকে কিছু হবে না। তা, এখানে কাজ পাব বলে আমারও ভরসা নেই।'

'ঠিক বলেছ। রাশিয়া ঘুরে এসে আমেরিকা যাওয়াই ভাল। জাপান এখনো অনেক পেছিয়ে আছে। এখনো এখানে চলছে অনেক ভাঙাগড়া, দেখছনা ?'

'কী আশ্চর্য ! সমঝে সামলে কথা বলবে তো ! আমি যদি আমেরিকাতে গিয়ে বলি যে একজন জাপানী ভদ্রলোক বলেছেন যে তাঁর দেশ এখনো পেছিয়ে আছে। সত্যি বলছি, আমি বলে দেব যে একথা বলেছেন একজন সরকারী অফিসার। তুমি এখনো সরকারী অফিসার তো ?'

'হ্যাঁ, আমি সরকারী চাকরী করছি।'

'আর ঠিকঠিক আচরণধারা মেনে চলেছ তো ?'

'ভয়াবহভাবে ! আমি একটি আসল "ফারসট" হয়ে উঠেছি, বুঝলে কেবল আজকের সন্ধ্যেটা ছাড়া।'

'আমার কী ভাগ্য !' মেয়েটি আস্তে আস্তে ওর হাতের দীর্ঘ দস্তানার বোতামগুলি খুলতে থাকে। ডানহাতটি বাড়িয়ে দেয় ওয়াতানাবের দিকে। সুগঠিত, ধপ্‌ধপে শাদা হাত। দৃঢ়ভাবে ওয়াতানাবে সে হাত আঁকড়ে ধরেন।

ভাবেন কী ঠান্ডা হাত! ওয়াতানাবের নাগাল থেকে হাত ছাড়িয়ে না নিয়ে মেয়েটি স্থির দৃষ্টিতে ও'র দিকে তাকিয়ে থাকে। ওর বড় বড় খয়েরী চোখ দুটিকে ঘিরে রেখেছে গাঢ় কালো ছায়া দেখাচ্ছে যেন দ্বিগুন বড়ো আগের থেকে।

'তুমি কি চাওনা, চুমু দিই?'

ওয়াতানাবে মুখটা একটু বাঁকালেন। বললেন, 'আমরা এখন জাপানে রয়েছি।'

বলা নেই কওয়া নেই, দরজা খুলে যায় দুহাঠ করে। ওয়েটার এসে হাজির। 'খাবার দেওয়া হয়েছে, আজ্ঞে।'

'আমরা রয়েছি জাপানে', ওয়াতানাবে পুনরুক্তি করলেন। মাথার ওপরের তীব্র আলোগুলো ওয়েটার জেবলে দিল আচমকা।

মহিলা আসন নিল ওয়াতানাবের মুখোমখি, কামরাটার চারধারটা ঘাড় ঘুরিয়ে দেখেও নিল। 'বাঃ এ দেখছি নিভৃত প্রকোষ্ঠ', হেসে উঠে বলল। 'কী দারুণ!' ঘাড় সোজা করে ওয়াতানাবের দিকে তাকালো। দেখতে চায় কী প্রতিক্রিয়া হয় সেখানে।

'এটা ঘটেছে দৈব বশে।' উনি বললেন বিচলিত না হয়ে। দুজনকে পরিবেষণের তদারকিতে তিনজন ওয়েটার লাগাতার লেগে রয়েছে।

একজন শেরি ঢালে তো আরেকজন নিয়ে আসে তরমুজের ফালি। তৃতীয়জন ব্যস্ত সমস্ত হয়ে দৌড়াদৌড়ি করে।

'এখানে তো দেখি ওয়েটারই গিজ গিজ করছে', ওয়াতানাবে বললেন।

'হ্যাঁ, এ এক বাজে ঝুট ঝামেলা', তরমুজের দিকে তাকিয়ে কনুই সোজা করে মেয়েটি বললে, 'আমার হোটেলেও ঠিক এরকম।'

'তোমার আর কোসিনস্কির মাঝখানে আপদগুলো এসে পড়ে তো। টোকা না দিয়ে দরজা খুলে ঢুকে পড়ে ঘরে, তাই না?'

'তোমার ধারণাগুলো বিলকুল বেঠিক, বুঝলে। তরমুজটা বেশ ভালো তা বলতে হবে।'

'আমেরিকায় গিয়ে দেখবে ভোরবেলা ঘুম ভেঙে ওঠা থেকেই গাদা গাদা খাওয়া কেবল।'

হালকা ভাসা ভাসা কথার ফাঁকে ফাঁকে সময় এগিয়ে চলে। ওয়েটারদের একজন শেষে ফ্রুট সালাড আনে—আরেকজন শ্যানপেন ঢালে।

'তোমার কি ঈর্ষা বোধ হচ্চেনা, একটুও?' মেয়েটি হঠাৎ শুধায়। সারা সময়টা ওরা আস্তে আস্তে খেয়েছে, গল্প করেছে। মেয়েটির মনে পড়েছে এমনিভাবে কতবার ওরা এর আগে বসে থেকেছে। থিয়েটার ভাঙার পরে Bluhr Steps এর ওপরের ছোট রেস্তোরাঁটাতে। মাঝে মাঝে ঝগড়াঝাঁটি হয়েছে আবার মিটমাট হতে দেরি হয়নি। ওর এখনকার কথাগুলিতে যেন ব্যঙ্গের সুর কিন্তু তৎসত্ত্বেও আন্তরিক ওর ভাবনাগুলো। তাইত ও যেন লজ্জা পায়।

ওয়াতানাবে শ্যামপেনের গ্লাসটা তুলে ধরলেন ফুলদানীর মাথা ছাপিয়ে। পরিষ্কার গলায় বললেন, 'কোসিনিস্কি সোল লেবেন।'

মেয়েটি কোন কথা না বলে গ্লাস তুলে ধরে। ওর মুখের হাসি যেন হিমের ছোঁয়ায় নিস্তব্ধ হয়ে গেছে। টেবিলের নীচে ওর একটি হাত কাঁপছিল থর থর করে।

রাত তখন মোটে সাড়ে আটটা। গির্জার ধার দিয়ে একখানা কালো গাড়ি আস্তে আস্তে যাচ্ছিল ঝিকমিকে অসংখ্য আলোর মধ্য দিয়ে। পেছনের সীটে বসেছিল একটি মহিলা, তার মুখখানি ঢাকা ছিল ওড়না দিয়ে।

পরিচিতি: মোরি ওগাই

মেইজি পুণরুত্থানের কালের এক দিকপাল সাহিত্যিকরূপে স্বীকৃত মোরি ওগাই-এর জীবনকাল 1862 থেকে 1922 পর্যন্ত। তাই তাঁর নামটি আধুনিক জাপানী সাহিত্যের যে কোন সঙ্কলনের শীর্ষে থাকবেই।

চিকিৎসকের সন্তান ওগাই টৌকিও বিশ্ববিদ্যালয় থেকে চিকিৎসা বিদ্যায় স্নাতক হয়ে সেনাদলে যোগ দেন শল্যবিদ হয়ে। 1884 সালে জার্মানীতে যান চিকিৎসা বিদ্যার উচ্চশিক্ষার জন্যে। সেখানে ছিলেন চার বছর। ইয়োরোপের সঙ্গে সরাসরি পরিচয় সাহিত্যিকদের মধ্যে তাঁরই হয় সর্বপ্রথম। তাঁর চিন্তা ও রচনাতে জার্মান প্রভাব বেশি লক্ষ করা যায়।

অসামান্য কর্মক্ষমতাশীল ওগাই সরকারী কর্তব্য যথাযথ পালন করার পরেও অক্লান্তভাবে সাহিত্য চালিয়ে গেছেন। তাঁর প্রথম দিকের রচনা জার্মান গল্প কবিতার অনুবাদ। সেনাদলে চীন-জাপান রুশ-জাপান দুই যুদ্ধেই ভাগ নেবার পরে 1907 সালে সার্জন জেনারেল এর পদে উন্নীত হন। 1916 সালে অবসর নিয়ে রাজকীয় সংগ্রহশালার ডিরেক্টর হন। আমৃত্যু সাহিত্য সেবা করে চলেন। 1890 সালে প্রকাশিত হয় The Dancing Girl এক জার্মান নৃত্যশিল্পী আর এক জাপানী যুবকের প্রেম নিয়ে লেখা কাহিনী। আলোচ্য গল্পে তার প্রতিধ্বনি পাওয়া যাবে। জাপানী সমালোচকেরা ওগাইকে সম্মানের শীর্ষাসনে বসিয়েছেন প্রধানত তাঁর উচ্চমানের অনুবাদগুলির জন্যে। গোয়টে, ইবসেন, শীলার, হানস ক্রিসটেন আন্ডারসন থেকে যেমন, তেমনি আবার প্রাচীন জাপানী সাহিত্য উদ্ধার কাজের পথদ্রষ্টা হিশেবে, আধুনিক জাপানী সাহিত্যের স্থপতির কাজে তাঁর অবদান তুলনাহীন। আবার পশ্চিমী ধাঁচের ছোট গল্প ও জাপানী সাহিত্যে প্রবর্তনার দায়ও নিতে হয় ওগাইকে।

ওগাই-এর পান্ডিত্য অরে সেই সঙ্গে স্বভাবজ সামরিক অনুশাসন তাঁর শেষের দিকের সাহিত্য কর্মগুলিকেই ইতিহাস নির্ভর গল্প উপন্যাস আর জীবনী রচনাতে নিবন্ধ করে। এই রচনাগুলি পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধান থেকে জাতির ইতিহাস ও পরম্পরাকে রক্ষা করার জন্যই রচিত হয়। তাই তাদের পাঠকও কম আর অনুবাদও অনায়াশ নয়।

সেইবেই-এর লাউ শিগা নাওইয়া

এই গল্পটা একটি ছোট ছেলে আর তার লাউকে নিয়ে। ছেলেটার নাম সেইবেই। পরবর্তী কালে সেইবেইকে লাউ-এর নেশা ছাড়তে হয়েছিল তবে অল্পকালের মধ্যে লাউয়ের জায়গাটা নিয়েছিল অন্য একটা নেশা: সেইবেই ছবি আঁকা ধরেছিল। আর এককালে যেমন লাউ নিয়ে মেতে উঠেছিল ঠিক তেমনিভাবেই সেইবেই ছবি আঁকায় একেবারে মগ্ন হয়ে যেত।

বাবা-মা জানতেন যে সেইবেই মাঝে মাঝে দোকান থেকে লাউ কিনে আনে। কয়েক সেন লাগত একেকটা লাউ কিনতে। কিছু দিনের মধ্যেই ওর বেশ কয়েকটা লাউ জমা হয়েছিল। লাউ নিয়ে এসে প্রথমে তার মাথার দিকে ছ্যাঁদা করত বীচিগুলো বের করে নিতে। এরপর চা পাতা ঢেলে দিত সেই গর্ত দিয়ে লাউয়ের ভিতরের বিচ্ছিরি গন্ধটা তাড়াতে। তারপর বাবার খাওয়া কাপের তলানি থেকে জমিয়ে রাখা সাকে দিয়ে যত্ন করে লাউয়ের খোলা পালিশ করতে বসে যেত।

লাউ-এর নেশায় সেইবেই পাগল। একদিন সমুদ্রের ধারে ও বেড়াচ্ছিল; মাথায় ওর প্রিয় বিষয় লাউ নিয়েই চিন্তা। একটা অদ্ভুত দৃশ্য দেখে ও একেবারে চমকে ওঠে। সমুদ্রের ধারের এক কুঁড়ে ঘর থেকে বেরিয়ে আসা এক বৃদ্ধের লম্বাপানা টাক মাথাটা ওর নজরে পড়েছিল। 'কি সুন্দর একটা লাউ'। সেইবেই ভাবল। গোলাপী টেকো মাথা নাড়তে নাড়তে বৃদ্ধ তো দৃষ্টির আড়ালে কখন চলে গেছে। তখন সেইবেই-এর হুঁশ হয়েছে। সেখানে দাঁড়িয়ে নিজের মনে ও জোরে হেসে উঠেছে। হাসতে হাসতে বাড়ি ফিরেছে।

সবজীর দোকান, কিউরিওর দোকান, মিষ্টির দোকান যেখানেই বিক্রির জন্যে লাউ টাঙানো থাকে সেইবেই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মন দিয়ে দ্যাখে—ওর কাছে মহামূল্য—ফলটির ভালমন্দ খুঁটিয়ে বিচার করে।



বারো বছরের সেইবেই কিন্তু এখনো প্রাইমারি স্কুলে পড়ে। ক্লাসের শেষে অন্য ছেলেদের সঙ্গে খেলতে যাওয়ার বদলে ও শহরের রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে খুঁজে বেড়ায় পছন্দ মত লাউ। তারপর সন্ধ্যে হলে বসবার ঘরের এককোণে পা মুড়ে বসে বসে লাউ ঘসা নিয়ে পড়ে। ঘসা শেষ হলে একটু সাকে মাথায় তারপর নিজেরই তৈরী কর্কের একটা ছিপি এঁটে লাউটাকে রাখে একটা টিনের বাক্সে—বাক্সটা এই জন্যেই ও সংগ্রহ করেছে। বাক্সশুদ্ধ লাউটাকে কাঠ কয়লার আগুনের পা গরম করবার উনুনের উপর রেখে শুতে যায়।

ঘুম থেকে উঠেই টিনের বাক্সটা নিয়ে বসে পরীক্ষা করে দেখে লাউটাকে। সারারাতের প্রক্রিয়ার দরুণ ভেতরটা স্যাঁতসেতে। মুগ্ধ চোখে নিজের সম্পত্তি দেখতে দেখতে সেইবেই লাউটার গলায় একটা সুতো বেঁধে বারান্দায় রোদ্দুরে টাঙিয়ে দেয় রোদে শুকোতে। তারপর স্কুলে চলে যায়।

সেইবেইদের শহরটা একটা ছোট বন্দর-শহর। নামেই শহর—একপ্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে পায়ে হেঁটে যেতে মোটে বিশ মিনিট লাগে। রাস্তায় রাস্তায় ঘোরা সেইবেই-এর নিত্য দিনের অভ্যাস। কোথায় কোথায় লাউ পাওয়া যায়—কটা লাউ বাজারের কোথায় কোথায় আছে সব খবর ওর জানা।

পাকা, শক্ত, শুকনো খোলা বিদঘুটে আকৃতির লাউ যেগুলি সাধারণত সংগ্রাহকেরা পছন্দ করে—সেগুলো আদৌ সেইবেইকে আকৃষ্ট করে না। ওর পছন্দ সুষম, সাধারণ আকৃতির লাউ।

'আপনার ছোট ছেলেটির তো দেখি সাদামাটা দেখতে লাউ-ই পছন্দ', বলছিলেন বাবার এক বন্ধু। বাবার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। সেইবেই বসবার ঘরেয় এককোণে বসে বসে গোলগাল সাধারণ দেখতে একটা লাউ নিয়ে পালিশ করছিল।

'দেখুন দিকি, লাউ নিয়ে বসে বসে কিত সময় নষ্ট করছে, এই বয়সের একটা ছেলে', বাবা বললেন, সেইবেই-এর দিকে হতাশার দৃষ্টিতে তাকিয়ে।

বন্ধু বললেন, 'সেইবেই, শোন দেখি। কী লাভ অতগুলো সাধারণ লাউ

নিয়ে এত খাটা খাটুনি। সংখ্যায় অনেক জড়ো করে কোন লাভ নেই। বরং দু একটা অস্বাভাবিক দেখে খুঁজে রাখো, কাজ দেবে।'

'আমার এই রকমই ভাল লাগে', বলে প্রসঙ্গটার ছেদ টেনে দেয় সেইবেই। বাবা আর তাঁর বন্ধু লাউ-এর বিষয় নিয়ে কথা চালিয়ে যান।

'সেই বাকিন-এর লাউটার কথা মনে পড়ে ?' বাবা বলছিলেন, 'গতগ্রীষ্মে কৃষি প্রদর্শনীতে যেটা দেখানো হয়েছিল, ভারি সুন্দর, তাই নয় কি ?'

'হ্যাঁ, মনে পড়েছে, সেই লম্বা, বড় লাউটা তো ?'

ওদের কথা শুনতে শুনতে সেইবেই-এর হাসি পাচ্ছিল। বাকিনের লাউ নিয়ে আদিখ্যেতা সে সময় খুবই হয়েছিল—তাই ও দেখতেও গিয়েছিল (জানত না যদিও বাকিন ছিলেন এক বিখ্যাত কবি)। ওর একটুও ভাল লাগেনি—বোকা বোকা দেখতে সাবারণ একটা বড় লাউ। প্রদর্শনী থেকে ও বেরিয়ে এসেছিল। 'আমার একটুও ভাল লাগেনি', কথার মাঝে সেইবেই ফোড়ন কাটে, 'অতি সাধারণ আখাম্বা লম্বা একটা লাউ।'

বাবার চোখে বিস্ময় আর রোষ। চিৎকার করে উনি বললেন, 'তুমি কথা-বলছ কেন ? যা জানো না তাই নিয়ে কথা বলতে আসো কেন ?'

সেইবেই আর কথা বাড়ায় নি।

অপরিচিত একটা গলি দিয়ে একদিন যেতে যেতে একটা ফলের দোকানে সেইবেই-এর দেখা হল এক বৃদ্ধার সঙ্গে। মহিলা বেচছিল শুকনো আলু-বোখরা আর কমলালেবু। স্টলের পেছনে বাড়িটার একটা জানলার খড়খড়ির ওপরে টাঙানো ছিল কতকগুলো লাউ।

'একটু দেখতে পারি', বলে সেইবেই স্টলের পেছনে চলে যায়। লাউ-গুলোকে নেড়ে চেড়ে দেখতে লেগে যায়। হঠাৎ ওর চোখে পড়ে বায় একটা লাউ। ইঞ্চি পাঁচেক লম্বা—প্রথম দৃষ্টিতে মনে হবে নেহাৎই সাধারণ। কিন্তু লাউটার আকৃতিতে কী যেন একটা রয়েছে। সেইবেই-এর হৃৎপিণ্ডের বেগ বেড়ে যায়।

'এটার দাম কত', ও জিগগেস করল, কথা বলতে ওর যেন হাঁফ ধরছিল।

বৃদ্ধ বলল, 'তুমি তো দেখছি নেহাতই বাচ্চা। তোমার কাছে আর কত চাইব। দশ সেন দিও।

ব্যগ্রভাবে সেইবেই বলে, 'তাহলে ওটা আমার জন্য রাখুন। আমি পয়সা নিয়ে এক্ষুণি আসছি। এক ছুট দিয়ে বাড়ী পৌঁছে গেছে, আবার তক্ষুণি ফিরে এসেছে পয়সা নিয়ে। লাউটা কিনে সঙ্গে করে নিয়ে গেছে বাড়িতে।

সেই মুহূর্ত থেকে নতুন লাউটা সেইবেই কখনো কাছ ছাড়া করেনি। স্কুলে গেছে তাও সঙ্গে নিয়ে গেছে। লুকিয়ে ক্লাসের সময়েই ডেসকের তলায় চুপি চুপি পালিশ করেছে। একজন মাস্টারমশাই-এর কাছে ধরা পড়তেও দেরি হয়নি। মাষ্টারমশাই রেগে আগুন, উনি আবার তখন পড়াচ্ছিলেন সদাচারের বিষয়ে।

এই মাস্টারমশাই-এর বাড়ি জাপানের অন্য একটা অঞ্চলে। লাউ সংগ্রহ করে রাখার মত মেয়েলি অভ্যাস ছোট ছেলেদের মধ্যে দেখে তিনি খুবই অপ্রসন্ন। সামুরাইদের শৌর্য বীর্যের কথা তাঁর মুখে সব সময় শোনা যেত। নানিওয়াবুশির পালা অভিনয় করতে যখন বিখ্যাত অভিনেতা কিউ মোয়েমন শহরে আসত আর প্রাচীনকালের বীরত্বের কাহিনীগুলি গেয়ে শোনাত তখন তার প্রতিটি অভিনয় তিনি দেখতে যেতেন। অন্য সময় যাত্রা থিয়েটারের কুখ্যাত পাড়ার ছায়া মাড়াতেন না। ছাত্রেরা বিকট স্বরে নানিওয়াবুশির গানগুলো ক্লাসের মধ্যে গাইলেও কিছু বলতেন না। কিন্তু সেইবেই-কে নিঃশব্দে লাউ পালিশ করতে দেখে রাগে কেঁপে উঠলেন।

'তুমি একটি গর্দভ।' হুঙ্কার দিলেন মাস্টারমশাই 'তোমার মতন ছেলের ভবিষ্যৎ বলে কিছু নেই।' লাউটা তো তক্ষুণি বাজেয়াপ্ত হল। কত ঘন্টার পরিশ্রম ব্যয় করেছে সেইবেই লাউটাকে সুন্দর করে তুলতে। সেইবেই স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। ও একটুও কাঁদেনি।

যখন বাড়ি ফিরল তখন ওর মুখখানা একেবারে ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। একটি কথাও না বলে পা দুখানি আগুনের ওপর রেখে শূন্য চোখে তাকিয়ে রইল দেয়ালের দিকে। কিছুক্ষণ বাদে মাস্টারমশাই এসে হাজির। বাবা

তাঁর কর্মস্থল কাঠের ফার্নিচারের দোকান থেকে তখনও ফেরেননি। মাস্টারমশাই-এর রোষটা গিয়ে পড়ল মায়ের ওপর।

চড়া গলায় মাস্টারমশাই বললেন, 'এসব হল বাড়ির দায়িত্ব। এমনটি যাতে না ঘটে সেটা দেখাই হল বাপ মায়ের কর্তব্য।' দুঃখে, লজ্জায় মাতো দিশাহারা, কোনরকমে দুএকটা কথা বলে ক্ষমা চেয়ে নেন।

সেইবেই তখন ঘরের এক কোণে দেওয়ালের সঙ্গে মিশে যেতে পারলে বাঁচে। সন্ত্রস্ত চোখে ও দেখছিল শান্তিলিপ্সু মাস্টারমশাই-এর দিকে। চোখ পড়ে যায় তাঁর ঠিক পেছনে দেওয়ালের গায়ে ঝুলিয়ে রাখা সারি সারি তৈরি হয়ে যাওয়া লাউ-এর দিকে। মাস্টারমশাই-এর চোখ একবার ওদিকে পড়লে কী হবে?

ভেতরে ভেতরে ও ভয়ে কাঁপছিল, অপেক্ষা করছিল চূড়ান্ত বিপদ এই বুঝি ঘটলো। কিন্তু বড় বড় কথাগুলো সব ফুরিয়ে গেলে রাগের বশে জোরে পা ফেলে মাস্টারমশাই চলে গেলেন। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল সেইবেই।

মা খুব বিনিয়ে বিনিয়ে কাঁদছিলেন। কান্নার সুরে ভৎসর্না মিলিয়ে সবে ওকে বকা শুরু করেছেন এমন সময় বাবা ফিরলেন দোকান থেকে। যা ঘটেছে সব তাঁর কানে গেল। ছেলের কলারটি পাকড়ে ধরে আগে তাকে দিলেন এক প্রস্ত মার। 'তুই একটা অপদার্থ,' হাঁক দিলেন, 'যে ভাবে চলেছিস কোথাও দাঁড়াতে পারবিনে এই দুনিয়াতে। ইচ্ছে হচ্ছে এক্ষুণি তোকে বাড়ি থেকে দূর করে দিই রাস্তায়, সেখানেই থাকবি ভাল।' দেওয়ালে টাঙানো লাউগুলোর দিকে এরপর ওঁর চোখ পড়ল। হাতুড়ি নিয়ে এসে একটি একটি করে প্রত্যেকটা লাউ ভেঙে টুকরো টুকরো করে ফেললেন। সেইবেই এর মুখখানা শুকিয়ে এতটুকু হয়ে গেল কিন্তু ও কোন কথা বলেনি।

পরের দিন কেড়ে নেওয়া লাউটা মাস্টারমশাই দিয়ে দিলেন স্কুলে কাজ করত এক মজুরকে। 'এই, এটা নিয়ে যা তো', যেন কোন অশুচি জিনিস ফেলে দিচ্ছেন। মজুর লাউটাকে নিয়ে গেল তার বাসায়। ঝুলকালিতে নোংরা দেয়ালের কোণে টাঙিয়ে রেখে দিল।

মাস দুই বাদে এমনিতেই গরীব মজুর বেচারার অর্থকষ্ট আরো বাড়লে পরে ও লাউটাকে নিয়ে গেল পাড়ার একটা কিউরিওর দোকানে। যদি দু চারটে তামার পয়সা জোটে ওটা বেচে। কিউরিওর দোকানদার লাউটাকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখল তারপর অনাগ্রহের সুরে মজুরের হাতে ফিরিয়ে দিতে দিতে বলল, 'পাঁচ ইয়েন আমি দিতে পারি।'

আশ্চর্য হয়ে গেছে, কিন্তু বৃদ্ধ মজুরও বুদ্ধি ধরে। খুব শান্ত গলায় ও বলল 'ওই দামে আমি বেচব না।' দোকানদার তক্ষুণি দশ ইয়েন দিতে রাজী। মজুর তখনও রাজী হয় না।

শেষপর্যন্ত লাউটা পেতে কিউরিওওয়ালাকে পঞ্চাশ ইয়েন দিতে হয়। মজুর তো নিজের সৌভাগ্যে খুশি হয়ে দোকান ছেড়ে বেরিয়ে পড়ল। এক বছরের মাইনে বখশিস দিচ্ছেন মাস্টারমশাইরা এমনটি কখনো ঘটেছে কি? মজুরটি খুবই চালাক। তাই এই প্রসঙ্গটা কারো কাছে সে উল্লেখ করেনি। মাস্টারমশাই বা সেইবেই কেউই কোনদিন জানতে পারেনি সেই লাউটার বরাতে কী ঘটেছিল। হ্যাঁ, মজুর চালাক ছিল ঠিকই তবে বোধ হয় খুব চালাক নয়। কেন না ও ভাবতেই পারেনি যে কিউরিওওয়ালা সেই একই লাউ একজন ধনী সংগ্রাহককে গছিয়েছিল ছশ ইয়েনের বিনিময়ে।

সেইবেই আজকাল ছবি নিয়ে মগ্ন। মাস্টারমশাই-এর ওপর এখন ওর আর একটুও রাগ নেই—বাবার ওপরও রাগ নেই—ওর দামী লাউগুলো টুকরো টুকরো করে ভেঙে দিয়েছিলেন বলে।

তবে ছবি আঁকা নিয়ে কিছুদিন হল বাবা আবার বকাবকি শুরু করেছেন।

পরিচিতি : শিগা নাওইয়া

জন্ম 1883 সালে এক সম্পন্ন অভিজাত পরিবারে। 1906 সালে পিয়রস স্কুল থেকে স্নাতক হয়ে বেরিয়ে টোকিওর রাজকীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে

ইংরেজি বিভাগে যোগ দিয়েছিলেন তবে কিছুকাল পরেই অধ্যয়ন ছেড়ে সৃষ্টিধর্মী সাহিত্য রচনায় সম্পূর্ণ মনোনিবেশ করেন। 1910 সালে এক তরুণ সাহিত্যিক গোষ্ঠীতে যোগ দেন। বিশের দশকের গোড়ার দিক পর্যন্ত এই গোষ্ঠীটা 'শিরাকাবা' নামে খুবই বিখ্যাত হয়ে যায় একটা প্রভাবশালী সাহিত্য আন্দোলনের মুখপাত্র হিসেবে। শিরাকাবা লেখকগোষ্ঠী নিজেদের মানবিকতার ধ্বজাধারী বলে প্রচার করত। এই নব্য আদর্শবাদীর দল টলস্টয় ও ডস্টোয়েভস্কি থেকে প্রেরণা পেয়ে বিশ্বাস করত মানব প্রেমও ভ্রাতৃত্বের শেষপর্যন্ত বিজয়ে।

আধুনিক জাপানী সাহিত্যিকদের মধ্যে শিগা হলেন বিরল একজন যিনি মুখ্যত ছোট গল্পের লেখক। চারটি দশক ধরে অসংখ্য ছোট গল্প লিখেছেন শিগা। এদের মধ্যে অনেকগুলিই মননপ্রধান আত্মজীবনীর খণ্ড চিত্র। কিছু আছে যাদের মধ্যে সেইবেই-এর লাউ অন্যতম—হ্রস্ব সূক্ষ্ম অনুভূতি প্রধান সরলভাবে লেখা গল্প যার মধ্যে পরিণত সরস ব্যঙ্গের অন্তঃসলিলা বহতা ধারা টের পাওয়া যায়। শিগার ভাষা সংক্ষিপ্ত, স্পষ্ট, সরল। অকপট বস্তুনির্ভর বর্ণনার সাহায্যে যে সব সূক্ষ্মভাব তিনি প্রকাশ করতে সক্ষম হন সেটা এমনই বিস্ময়কর যে তাঁকে অনুসরণ করে একটা স্টাইলই গড়ে উঠেছে নাম দেওয়া হয়েছে শিগা স্টাইল।

উল্কি : তানিজাকি জুনিচিরো

অনেকদিন আগেকার কথা। সে একটা যুগ গিয়েছে যখন লঘুতা একটা অভিজাত গুণ বলে বেশ সমাদর পেত। এখনকার কালের মত বেঁচে থাকার জন্যে নিরন্তর লড়াই তখনো পর্যন্ত অজানা ছিল। অভিজাত বংশের শিরোমণি ছিল যারা আর যারা তাদের মোসাহেব, তদের মুখের ওপর শঙ্কার কোন কালো ছায়া পড়ত না। সভাস্থলে সুন্দরী প্রধানারা আর পটীয়সী নটীরা ছিল সদা হাস্যমুখী। সভাকক্ষের বিদূষকেরা, চায়ের আসরের বৃত্তিধারী হাস্যরসিকেরা খুব সম্মান পেত। জীবনে শান্তি ছিল, আনন্দ ছিল। তখনকার কালের নাটকে, কাব্যে সৌন্দর্য আর প্রতিপত্তি অবিচ্ছেদ্য-রূপে কীর্তিত হত।

দেহজ সৌন্দর্য বস্তুতপক্ষে জীবনের মূল লক্ষ্য বলে গণ্য হত আর তারই সাধনায় মানুষ কী না করত। এমন কি তারা সারা গায়ে উল্কিও আঁকিয়ে নিত। তাদের শরীরের ওপর উজ্জ্বল রঙের উল্কির রেখাগুলো যেন জট-পাকানো একধরনের নৃত্যের ভঙ্গিমায় ক্রীড়ারত থাকত। নৃত্যগীতাদি মুখর প্রমোদ পল্লীতে পাল্কী চড়ে যাবার কালে অভিজাতেরা উল্কি আঁকা পাল্কীর বেহারাদেরই নির্বাচন করত। আর ইয়োশিওয়রা আর তাতসুমির পণ্যবনি-তারাও তাদের প্রণয় বিতরণ করত সেই সব পুরুষদেরকে যাদের দেহের ওপর সুন্দরভাবে উল্কিচিহ্ন থাকতশোভমান। অক্ষশালায় যাদের নিত্য যাওয়াআসা ছিল, যেমন চুল্লী জ্বালাবার কর্মী, দোকানদার এমন কি সামুরাই-যোদ্ধারাও উল্কি শিল্পের সহায়তা নিত। প্রায়ই উল্কির প্রদর্শনী হত,সেখানে অংশ নিত যারা তারা সকলেই পরস্পরের দেহের উপর আকা উল্কি চিহ্নগুলির বৈচিত্র্যের খুঁটিনাটি নিরীক্ষণ করে দেখত—কোনটার রচনার নতুনত্বকে প্রশংসা করত, কোনটার বা দোষ ত্রুটি নিয়ে সমালোচনা করত।

এক তরুণ প্রতিভাধর উল্কি শিল্পীর খুব নাম ডাক ছিল। তার আঁকা

উল্কি ফ্যাশনের জগতে বিশেষ আদৃত হত আর তার খ্যাতি আসাকুসা অঞ্চলের চারিবেন, মাৎসুশিমাচো অঞ্চলের ইয়াকোহেই আর কোনকোনজিরো প্রমুখ প্রবীণ শিল্পগুরুদের সঙ্গে পাল্লা দেবার স্পর্ধা রাখত। উল্কি প্রদর্শনীতে তার কাজের খুব কদর হত আর চারুকলাপ্রেমী মাত্রই চাইত তার মক্কেল হতে। শিল্পী দারুমাকিনের খ্যাতি ছিল তার অপূর্ব রেখাঙ্কনের জন্যে। কারাকুসা গোনতার প্রসিদ্ধি ছিল সিঁদুর রঙের উল্কির জন্যে আর এই শিল্পী সেইকিচির নামডাক ছিল তার বিষয় বৈচিত্র্য আর তাদের উদ্দামতার গুণের জন্যে।

এর আগে চিত্র শিল্পী হিসাবে সেইকিচি কিছুটা খ্যাতি পেয়েছেন। তার চিত্রাঙ্কণ তোয়োকুনি আর কুনিসাদার প্রবর্তিত চিত্রাঙ্কণ ধারা দিয়ে চিহ্নিত হত। চিত্রশিল্পী থেকে উল্কি আঁকিয়ের বৃত্তিতে যাওয়া অবনতি হলেও প্রকৃত শিল্পীর রসবোধ ও সংবেদনা ওর মধ্যে বজায় ছিল। যাদের ত্বক বা সাধারণ আকৃতি ওর মনে ধরত না তাদের নিয়ে কাজ করতে ওকে রাজী করানো যেত না আর যে সব খদ্দেরদের বরাত স্বীকার করত তাদের মেনে নিতে হত উল্কির নকসাটা কেমন হবে কিংবা পারিশ্রমিক কত হবে। তার ওপর সেই সব খদ্দেরদের সহ্য করতে হত হয়ত এক মাস কি দু মাস ধরে শিল্পীর সূচ বেঁধানোর নিদারুণ যন্ত্রণা।

এই উল্কি শিল্পীর হৃদয়ের মধ্যে অসন্দিগ্ধভাবে সুপ্ত ছিল নানাবিধ বাসনা ও প্রমোদতৃষ্ণা। ওর সূচ বেঁধানোর দরুন খদ্দেরের মাংস ফুলে উঠত। ত্বকের ওপর গাঢ় লাল রক্ত ফুটে বেরোত। ওর খদ্দেররা যখন কষ্ট আর সহ্য করতে পারত না তখন তারা যন্ত্রণায় চিৎকার করে উঠত। ওরা যন্ত্রণায় যতই কাতরোক্তি করত শিল্পীর অদ্ভুত উল্লাস যেন ততই বাড়ত। সিঁদুর রঙের উল্কির নকসা ওর বেশি পছন্দ ছিল—এই ধরনের উল্কি আঁকতে সবচেয়ে বেশি কষ্ট সহ্য করতে হয়। ওর খদ্দেরদের যখন পাঁচশ কি ছ'শবার বিঁধ সহ্য করার পরে ফুটন্ত গরম জলে স্নান করতে হত নকসার রং ভাল করে খুলবে বলে তখন প্রায়ই তারা সেইকিচির পায়ের তলায় অর্ধমৃত হয়ে হতচেতন অবস্থায়



পড়ে থাকত। ওরা যখন নড়তে চড়তে না পেরে নিরুপায় হয়ে পড়ে আছে তখন খুব পরিতৃপ্তির হাসি হেসে সেইকিচি শুধাতো, 'তাহলে সত্যি সত্যিই লাগে, তাই না?'

কোন খদ্দের হয়ত একটু ভীতু প্রকৃতির যার দাঁতগুলো ঠকঠক করে কাঁপছে কিংবা যন্ত্রণায় চেঁচিয়ে উঠছে। সেইকিচি তখন বলত, 'আশ্চর্য, কিয়োটোতে তোমার বাড়ি, সেখানকার লোকে তো সাহসী হয়। ধৈর্য ধরতে হবে। আমার সূচগুলো দারুণ যন্ত্রণা দেয় কিন্তু।' আড়চোখে খদ্দেরের মুখের দিকে তাকিয়ে দেখত, সে মুখ তখন চোখের জলে ভিজে, তারপর ভ্রূক্ষেপ মাত্র না করে নিজের কাজ করে যেত। আবার খদ্দের হয়ত মুখ বুজে যন্ত্রণা সহ্য করে চলেছে তখন ও বলত: 'বাঃ, তোমাকে দেখে তো মনে হয়নি এত সাহস তোমার মধ্যে ছিল। তবে রোসো একটু। এখুনি দেখতে পাবে চুপচাপ থাকতে আর পারবে না—যতই কেন চেষ্টা করো।' এই কথা বলে দাঁতগুলো ওর বেরিয়ে পড়ত।

বেশ কয়েক বছর ধরে সেইকিচির মনে মনে প্রবল একটা ইচ্ছে ছিল ওর সূচের মুখে কোন সুন্দরী নারীর উজ্জ্বল ত্বক যদি পায়। ও স্বপ্ন দেখত যে সেই ত্বকের ওপর উল্কির মাধ্যমে ওর নিজের মন প্রাণ উজাড় করে দেবে। ওর কল্পনার সেই মেয়েটির মধ্যে থাকতে হবে অনেকগুলি গুণ, দেহগত আবার চরিত্রগতও। কেবল সুন্দর মুখশ্রী আর মসৃণ ত্বকে সেইকিচির মন উঠবে না। নটীদের মধ্যে ডাকসাইটে সুন্দরী বলে যাদের খ্যাতি ছিল তাদের মধ্যে সেইকিচি অনেক খুঁজেছে কিন্তু কারোর মধ্যে পায়নি ওর আদর্শের মাপ কাঠির সমতুল্য কারোকে। সেই মেয়ের ভাবমূর্তি সদাজাগ্রত থাকত ওর মনের মধ্যে। ইতিমধ্যে যদিও তিনটি বছর ঘুরে গেছে, ওর মনের বাসনা কিন্তু উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছে।

ফুকাগাওয়া জেলায় গ্রীষ্মকালের এক সন্ধ্যায় সেইকিচি বেরিয়েছিল সান্ধ্যভ্রমণে। বেড়াবার কালে ওর দৃষ্টি আকৃষ্ট করেছিল ধপধপে শাদা

একটি মেয়ের পা। পালকীর পর্দার মধ্যে অন্তর্হিত হয়ে যাচ্ছে। একটি পা যে কত রকমের অভিব্যক্তি প্রকাশ করতে পারে ঠিক একটি মুখেরই মত—আর সেই শুভ্রবর্ণ পাখানি সেইকিচির কাছে মনে হয়েছিল যেন দুর্লভতম কোন রত্নেরই সমান। আঙুলগুলি গঠনের দিক থেকে নিখুঁত, নখগুলি থেকে যেন দীপ্তি ঠিকরে বেরোচ্ছে। তারা এতই চকচকে যেন মনে হবে কোন পাহাড়ী ঝরণার স্বচ্ছ জলের ধারা অনেককাল ধরে সেই নখগুলিকে সিক্ত করেছে। সব মিলিয়ে একখানি সম্পূর্ণ নিখুঁত পায়ের সৃষ্টি হয়েছে যা কিনা পুরুষের হৃদয়কে উতরোল করে তুলতে পারে—তারপর তার অন্তরাত্মাকে দলিত মথিত করতে পারে। সেইকিচি বুঝল যে এই পায়ের অধিকারিণী হল সেই মেয়ে যাকে সে এতগুলো বছর ধরে খুঁজছে। উৎফুল্ল মনে পালকীর পেছন পেছন সেইকিচি ধেয়ে চলল—অন্তবর্তিনীকে যদি এক পলক দেখা যায়। কিন্তু রাস্তায় রাস্তায় খানিক ঘোরার পরে একটা বাঁকের মুখে পালকীটাকে হারিয়ে ফেলল। তারপর থেকে মনের মধ্যে যেটা এতদিন ছিল একটা অস্পষ্ট ইচ্ছে হয়ে সেটা একটা দুরন্ত বাসনা হয়ে উঠল।

বছর খানেক পরে একদিন সকালবেলা। ফুকাগাওয়া জেলায় ওর নিজের বাড়িতে সেইকিচির কাছে এক অতিথি এসে হাজির। একটি তরুণী—পাঠিয়েছে ওরই এক বান্ধবী তাৎসুমী পাড়ার এক গেইসা রমণী। একটা কাজের ভার দিয়ে।

ভয়ে ভয়ে মেয়েটি এসে বলল, 'অপরাধ নেবেন না। আমার মনিব এই কোটটা নিজে হাতে করে আমাকে আপনার কাছে পেঁাছে দেবার হুকুম করেছেন। আপনাকে অনুরোধ জানিয়েছেন যে কোটটার লাইনিং-এর ওপর একটা নকসা যদি এঁকে দেন।'

মেয়েটা ওর হাতে একটা চিঠিও তুলে দিল কোটটার সঙ্গে। কোটটা জড়ানো ছিল একটা কাগজে। কাগজটার ওপরে অভিনেতা আওয়াই তোজাকুর ছবি আঁকা। চিঠিতে গেইসা জানিয়েছে যে চিঠি আর কোট যার হাত দিয়ে

পাঠাচ্ছে সেই কমবয়সী মেয়েটিকে ও সম্প্রতি পালন পোষণ করেছে। শিগগিরই পানশালায় গেইসা হিসেবে ওর আবির্ভাব হতে চলেছে। ওকে নতুন জীবিকায় প্রতিষ্ঠিত করে দিতে যদি কিছু করতে হয় তাই করে দিতে সেইকিচিকে বান্ধবী অনুরোধ জানিয়েছে।

সেইকিচি মেয়েটিকে ভাল করে দেখে নিল। বয়স ষোল থেকে সতেরর বেশি নয় কিন্তু ওর মুখের ভাবে আশ্চর্য পরিণতির ছাপ লক্ষ করা যায়। ওর চোখের ভেতর থেকে প্রতিফলিত হচ্ছে সেইসব সুদর্শন যুবা পুরুষ আর সুন্দরী যুবতী নারীর স্বপ্ন যারা এই শহরে থাকে, যেখানে গোটা দেশের সমস্ত ভাল-মন্দ পাপ-পুণ্য বুঝি কেন্দ্রিত হয়েছে। তারপর সেইকিচির দৃষ্টি নেমে এল ওর সুগঠিত পা দুখানির দিকে। সে পা দুটি ঢাকা রয়েছে রাস্তায় চলার উপযোগী ঘাসের বিনুনী ছাওয়া কাঠের পাদুকায়।

'আচ্ছা, গত জুন মাসে তুমি কি কোনদিন হিরাসেই রেস্তোরাঁ থেকে পালকী করে ফিরে যাচ্ছিলে?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ', এই অদ্ভুত প্রশ্ন শুনে মেয়েটি সহাস্যে উত্তর দিল, 'আমার বাবা তখনো বেঁচে ছিলেন। তিনি মাঝে মাঝে আমাকে নিয়ে যেতেন হিরাসেই রেস্তোরাঁয়।'

'তোমার জন্যে আমি পাঁচ বছর ধরে প্রতীক্ষা করছি,' সেইকিচি বলল। 'তোমার মুখ আমি এই প্রথম দেখলাম—কিন্তু তোমার পা দুখানি আমার খুব চেনা। তোমাকে আমি একটা জিনিস দেখাব। ভেতরে এসো, ভয় পেও না।'

এই বলে দ্বিধাগ্রস্ত মেয়েটির একখানা হাত ধরে সেইকিচি তাকে সিঁড়ি দিয়ে ওপরের তলায় একটা কামরায় নিয়ে গেল। এই কামরার জানালা থেকে দেখা যায় একটা বড় নদী। দুটো বড়ো বড়ো গুটিয়ে রাখা পটচিত্র নিয়ে এসে মেয়েটির সামনে একটা মেলে ধরল।

এই চিত্রটা ছিল নিষ্ঠুর চৌ নামে খ্যাত প্রাচীন চীনা সম্রাটের একজন প্রধানা মহিষীর। শ্লথ ভঙ্গিতে বারান্দায় দেহভার এলিয়ে দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছেন,

পোশাকের প্রান্ত ছুঁয়ে আছে একসারি সিঁড়ির ধাপ—সিঁড়িটা শেষ হয়েছে উদ্যানের কিনারায়। ছোট্ট সুগঠিত মাথা এতই সূক্ষ্ম ও ভঙ্গুর যেন মনে হচ্ছে মুকুটের ভার সহ্য করতে পারছে না। প্রবাল, লাপিসলাজুলি ও অন্যান্য মণিমাণিক্য দিয়ে মুকুটখানা খচিত। ডান হাতে ঈষৎ তেরছা করে ধরা আছে একটি পাত্র—অলস ভঙ্গিতে তাকিয়ে আছেন এক বন্দীর দিকে উদ্যানে যার শিরচ্ছেদ করা হচ্ছে।

বন্দীর হাত পা একটা খুঁটির সঙ্গে বাঁধা। শেষ মুহূর্তের জন্যে সে অপেক্ষা করছে। চোখ বোজা, হেঁট মাথা। এই ধরনের দৃশ্যের ছবি কুরুচির পর্যায়ে পড়ে কিন্তু চিত্রকর রাজ মহিষীর আর হন্যমান বন্দীর মুখের অভিব্যক্তিগুলি এমন নিপুণতার সঙ্গে ফুটিয়ে তুলেছে যে পটটিকে উচ্চমানের শিল্পকীর্তি বলে গণ্য করা যায়।

তরুণীটি কিছুক্ষণ অপলক দৃষ্টিতে এই অদ্ভুত চিত্রপটের দিয়ে তাকিয়ে রইল। নিজের অজ্ঞাতে তার চোখের দৃষ্টি উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, ঠোঁট কাঁপতে থাকে। ক্রমশ তার মুখ মণ্ডলে চিত্রিত চীনা রাজপুত্রবালার সঙ্গে সাদৃশ্য ফুটে ওঠে।

'তোমার নিজের অন্তরটা প্রতিফলিত হয়েছে এই চিত্রটিতে', হৃষ্ট মনে মেয়েটির দিকে তাকিয়ে সেইকিচি বলল।

'এই সাংঘাতিক ছবিটা আমাকে কেন দেখালেন?' নিজের পাংশু কপালে হাত বুলিয়ে নিয়ে মেয়েটি শুধালো।

'এই চিত্রে যাকে বর্ণনা করা হয়েছে সে তুমিই। তারই রক্ত বহমান রয়েছে তোমার শরীরে।'

এর পর সেইকিচি অপর পটচিত্রটি মেলে দিল। এই চিত্রটির নাম 'নিহতেরা'। ছবিটার কেন্দ্রস্থলে চেরীগাছে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে একটি তরুণী। পায়ের তলায় পড়ে আছে একদল পুরুষের মৃতদেহ তার শুভ্র মুখ মণ্ডলে পরিস্ফুট হয়েছে পরিতৃপ্তি আর অহঙ্কার। মৃতদেহগুলোর চারপাশে একঝাঁক ছোট ছোট পাখি সরবে ঘুরে বেড়াচ্ছে। চিত্রকর বসন্তের

উদ্যান নাকি যুদ্ধক্ষেত্র আঁকতে চেয়েছিল সেটা বোঝা দুষ্কর।

'এই চিত্রটাতে রূপ পেয়েছে তোমার ভবিষ্যৎ', সেইকিচি বলল, চিত্রে বর্ণিত তরুণীটির দিকে ইঙ্গিত করে। এই মুখখানিতেও আগন্তুক মেয়েটির মুখের আদল চেনা যায়। 'মাটিতে পড়ে আছে যে সব যুবক তারা সবাই প্রাণ হারাবে তোমরাই কারণে।'

'ওঃ। মিনতি করছি', মেয়েটি চিৎকার করে ওঠে, 'ছবিটা সরিয়ে নিন।' ছবিটার ভয়ঙ্কর আকর্ষণ এড়াবার জন্যেই যেন সেদিক থেকে সরে এসে ঘাসের মাদুরের ওপরে মুখ ঢেকে শুয়ে পড়ল, ওর ঠোঁট দুটি কাঁপছিল, গোটা দেহখানা শিউরে শিউরে উঠছিল। 'মালিক, আপনার কাছে স্বীকার করছি। আপনি ঠিকই আন্দাজ করেছেন। আমার ভেতরের প্রকৃতিটা ওই মেয়েটারই মত। আমাকে দয়া করুন। ছবিটা সরিয়ে রাখুন।'

'ভীরুর মত কথা বোলো না। তার চেয়ে বরং ছবিটা মন দিয়ে দেখো। তাহলে দেখবে খানিকবাদে আর তোমার ভয় করছে না।'

ভয়ে তরুণী মাথা তুলতে পারছিল না—কিমোনোর হাতা দিয়ে ওর মুখ-খানা ঢাকা ছিল। মাদুরের ওপরে ওর দেহখানা পড়েছিল মেঝেতে, সেখান থেকে ও কেবলই বলছিল, 'মালিক, আমাকে বাড়ি ফিরে যেতে দিন—আপনার কাছে আমার ভয় করছে।'

'খানিকক্ষণ তোমাকে থাকতে হবে আমার কাছে', কঠোরভাবে বললে সেইকিচি, 'তোমাকে প্রকৃত সুন্দরী করে তুলতে একমাত্র আমিই পারব।'

তাকের ওপর ওর বোতল সূচ আদি সরঞ্জামের মধ্যে থেকে সেইকিচি বেছে নিল একটা শিশি যার ভেতরে ছিল অবশ করে দেওয়া এক উগ্র মাদক।

নদীর জলের ওপর সূর্যের কিরণ ঝলসে উঠছিল। প্রতিফলিত রশ্মিগুলি দরজার পাল্লাগুলোর ওপরে, নিদ্রিত মেয়েটির ওপরে সোনালী তরঙ্গের আঁকি বুকি কেটে চলেছিল। দরজাগুলো বন্ধ করে সেইকিচি বসেছিল ঘুমন্ত মেয়েটির পাশে। এই প্রথম মেয়েটির অদ্ভুত সৌন্দর্য ভাল করে

উপলব্ধি করতে ও ফুরসুৎ পেয়েছে। ওর মনে হচ্ছিল ওই নিশ্চল মুখখানির দিকে বুঝি বছরের পর বছর চেয়ে থাকা যায়।

কিন্তু নিজের উদ্দেশ্যের প্রেরণায় খুব বেশিক্ষণ ও বসে থাকে নি। উল্কি আঁকার যন্ত্রপাতি তাক থেকে নামিয়ে সেইকিচি মেয়েটার দেহ আবরণ মুক্ত করেছিল। তারপর বাঁ হাতের বুড়ো আঙুল, অনামিকা আর কড়ে আঙুল দিয়ে কলম ধরে আগা দিয়ে মেয়েটার পিঠ চিত্রিত করা শুরু হয়ে যায়।

আঁকা হয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে ডান হাতে ধরা সূচ লাইন বরাবর বিঁধিয়ে দিতে থাকে। মেমফিস-এর লোকেরা যেমন এক কালে স্থানে স্থানে স্ফিংকস আর পিরামিড রচনা করে মিশর দেশের ভূমির শোভা বর্ধন করেছিল সেইকিচি ঠিক সেই রকম এই তরুণী মেয়েটার নিষ্কলুষ ত্বক চিত্রিত করে তুলছিল। উল্কি-শিল্পীর মন প্রাণ যেন চিত্রণের রূপকল্পের ভেতরে প্রবিষ্ট হয়ে যাচ্ছিল। সিঁদুর রঙের প্রতিটি ফোঁটা দিয়ে যেন শিল্পী তার নিজের দেহের রক্ত মেয়েটির শরীরে নিষিক্ত করে দিচ্ছিল।

সময় কোথা দিয়ে বয়ে যাচ্ছিল সে দিকে সেইকিচির হুঁস ছিল না। দুপুর গড়িয়ে বিকেল হল। দেখতে দেখতে বসন্তের কোলাহল শূন্য দিনের অবসান হয়। সেইকিচির ক্লান্তিহীন হাত নিজের কাজ করে চলে। মেয়েটির ঘুম মুহূর্তের জন্যেও ব্যাহত হয় না। অচিরে আকাশে চাঁদের উদয় হয়। নদীর অপর পারে স্বপ্নের মত সেই চাঁদের আলো বিছিয়ে যায় বাড়ির ছাদে। উল্কি তখনো অর্ধেকও আঁকা হয়নি। কাজ থামিয়ে সেইকিচি বাতি জ্বালায় তারপর আবার বসে সূচের দিকে হাত বাড়ায়।

এখন প্রতিটি রেখা আঁকতে, প্রতিবার সূচ বেঁধাতে রীতিমত পরিশ্রম হচ্চে। শিল্পীর দীর্ঘশ্বাস পড়ে। বুঝি ওর হৃৎপিন্ডের ভেতরে পাচ্ছিল সূচ বেঁধানোর জ্বালা। আস্তে আস্তে ফুটে উঠছিল প্রকান্ড এক মাকড়সার অবয়ব। ভোরের পান্ডুর আলো কামরাটার মধ্যে ফুটে ওঠার সাথে সাথে বীভৎস আকারের প্রাণীটা তার আটখানা পা মেয়েটার পিঠের ওপর ছড়িয়ে দিয়েছিল।

বসন্তের রাত প্রায় শেষ। নদীর বুকের ওপর দিয়ে বেয়ে যাওয়া নৌকার দাঁড়গুলোর ছলাৎ ছলাৎ শব্দ শোনা যায়। ভোরের হাওয়ায় কেঁপে ওঠা মাছ-ধরা নৌকোর পালগুলো কুয়াশার ফাঁকে ফাঁকে চোখে পড়ে; তার মানে কুয়াশা কেটে যাচ্ছে। অবশেষে সেইকিচি নিবৃত্ত হয়। ও নিরীক্ষণ করে দেখতে থাকে মেয়েটার পিঠের উপরে উল্কি আঁকা প্রকান্ড স্ত্রী মাকড়সার নকসাটা। ও উপলব্ধি করতে পারে যে এই শিল্প কর্মটির মধ্য দিয়ে ও প্রকাশ করতে পেরেছে ওর নিজের গোটা জীবনের মর্মকথা। এখন এই যে কাজটা সম্পন্ন হয়ে গেছে—এক বিরাট শূন্যতার অনুভব এখন শিল্পীর চেতনা আচ্ছন্ন করেছে।

'তোমার মধ্যে সৌন্দর্য ফুটিয়ে তুলতে আমি আমার সম্পূর্ণ সত্তাটাকে ঢেলে দিয়েছি এই উল্কির মধ্যে', অস্ফুট স্বরে সেইকিচি আওড়াচ্ছিল। 'এখন থেকে সারা জাপানে তোমার সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে আর কোন নারী রইল না। সব পুরুষ, যত পুরুষ আছে তাদের সবাই এখন ঘায়েল হবে তোমার হাতে…'।

মেয়েটা কি ওর কথাগুলি শুনতে পেয়েছিল? ওর ওষ্ঠ থেকে শোনা গেল ক্ষীণ একটা কাতরোক্তি, ওর হাত-পা গুলির নড়াচড়া শুরু হল। আস্তে আস্তে ওর জ্ঞান ফিরে আসতে থাকে, শোয়া অবস্থায় ওর ভারী নিঃশ্বাস ওঠা পড়ার সাথে সাথে মাকড়সার পাগুলো জীবিত প্রাণীর মত নড়াচড়া করতে থাকে।

'তোমার কষ্ট হচ্ছে', সেইকিচি বলছিল। 'হবেই তো, মাকড়সা তোমার দেহটাকে কেমন ঘনিষ্ঠভাবে আলিঙ্গন করছে।'

মেয়েটা চোখের পাতা কিছুটা মেলে তাকায়। প্রথমে সেই দৃষ্টিতে শূন্যতা, তারপর চোখের তারায় উজ্জ্বলতা ফিরে আসে। সেই উজ্জ্বলতা সেইকিচির মুখমন্ডলের ওপর প্রতিবিম্বিত চাঁদের আলোর সমতুল্য।

'মালিক, আমার পিঠে যে উল্কি এঁকেছেন সেটা আমাকে দেখান! আপনার নিজের সত্তা যদি তাতে ঢেলে দিয়ে থাকেন তাহলে আমি নিশ্চয় অনেক বেশি সুন্দরী হয়েছি!'

মেয়েটা কথা বলছিল যেন স্বপ্নের ঘোরে, কিন্তু তাহলেও তার কণ্ঠস্বরে ব্যক্ত হচ্চে একটা নতুন আত্মবিশ্বাস, একটা শক্তি।

'আগে তোমাকে চান করতে হবে, যাতে রংগুলো উজ্জ্বলভাবে ফুটে ওঠে', সেইকিচি উত্তর দিল। ওর স্বভাব বিরুদ্ধ আর্দ্র কোমলস্বরে আরো বলল, 'তোমার কষ্ট হবে, খুব কষ্ট হবে। মনে সাহস আনো।'

'সুন্দরী হবার জন্যে আমি সব কষ্ট সহ্য করতে পারব', মেয়েটা বলল। সেইকিচিকে অনুসরণ করে মেয়েটা সিঁড়ি বেয়ে নীচের তলায় স্নানঘরে গেল। ধোঁয়া ওঠা ফুটন্ত জলে পা দেবার সঙ্গে সঙ্গে যন্ত্রণায় ওর চোখে জল এসে যায়।

'আঃ! আঃ! জ্বলে গেল।' যন্ত্রণায় ও কাতরাতে থাকে। 'মালিক আপনি ওপরে যান। আমি আসছি খানিক পরে। আমি চাই না কোন পুরুষ দেখুক আমার এই কষ্টে ছটফট করা।'

কিন্তু, স্নানের চৌবাচ্চা থেকে বাইরে পা রাখতে রাখতে গা মোছার শক্তি ওর আর থাকে না। সেইকিচির বাড়িয়ে দেওয়া হাত সরিয়ে দিয়ে ও মেঝের ওপর ধসে যাওয়া স্তূপের মত ঝরে পড়ে। ওর আলুলায়িত কেশদাম মেঝের ওপর লুটিয়ে ও শুয়ে শুয়ে কাতরাতে থাকে। পেছনে রাখা আয়নাতে ওর দুই পায়ের পাতার প্রতিবিম্ব পড়ে। শঙ্খের মত শুভ্রতায় ঝলমল করে সেই প্রতিবিম্ব।

সেইকিচি ওপরে উঠে গিয়েছিল—ওর জন্য অপেক্ষা করছিল। অনেক বিলম্বের পরে মেয়েটা যখন ওর কাছে এল তখন সে সযত্নে বেশবাস করে এসেছে। সদ্যস্নাত এলো কেশ আঁচড়ানোর পর কাঁধের ওপর ছড়ানো। টিকলো ওষ্ঠাধর বাঁকা ভ্রূ এখন আর শারীরিক কষ্টের ইঙ্গিতবাহী নয়। নদীর দিকে দৃষ্টি মেলে দেবার কালে, একধরনের দীপ্তি টের পাওয়া যায়। এত কম বয়স হলেও ওর হাবভাব যেন পরিণত বয়সের নারীর মত। যে নারী চা-পানের প্রমোদ শালাতে অনেক কাল ব্যতীত করেছে। পুরুষের হৃদয়ের মাপজোক করতে পোক্ত হয়েছে। হতচকিত সেইকিচি ভেবেই পায় না যে এই

সেই মেয়ে। একদিনের মধ্যে কী করে এতখানি বদলে গেল। অপর কামরা থেকে ও নিয়ে এল গুটিয়ে রাখা পটচিত্র দুটি যে চিত্র ও আগের দিন মেয়েটাকে দেখিয়েছিল।

'এই চিত্র দুটি আমি তোমাকে দিলাম', সেইকিচি বলল। 'আর উল্কিটাও। ওটা তো তোমারই রইল।'

'মালিক', মেয়েটা বলল, 'আমার মনে এখন আর কোন রকমের ভয় ডর নেই। আর আপনি না তুমি, তুমিই হবে আমার প্রথম শিকার!'

মেয়েটা ওর দিকে চোখ তুলে তাকালো—দৃষ্টি তো নয়—যেন নতুন শান দিয়ে আনা দুটো ছোরার ফলা। এ হল সেই তরুণী চীনা রাজকুমারীর চোখের দৃষ্টি—এ দৃষ্টি সেই অপর নারীর—চেরীগাছের কাণ্ডে দেহভার এলিয়ে দিয়ে গীতরত পাখির জটলা আর মৃত মানুষের দলের মধ্যে যে বসে ছিল। সেইকিচির মনের মধ্যে উথলে ওঠে সাফল্যের হর্ষোল্লাস।

'দেখিতো তোমার উল্কিটা,' ও বলল মেয়েটাকে—'উল্কিটা দেখাও।'

কোন কথা না বলে মেয়েটা মাথা নীচু করে ওর পোশাক সরিয়ে দিল। সকালের সূর্যের আলো তরুণীর পিঠের ওপর পড়ল। সেই সূর্যের সোনার কিরণ যেন আগুন রঙে রাঙিয়ে দিল মাকড়সাটাকে।

পরিচিতি : তানিজাকি জুনিচিরো

তানিজাকি জুনিচিরো-র জন্ম টোকিওতে 1886 সালে প্রাচীন বণিক পরিবারে। বাবা ছিলেন ধান চালের দালাল। সেকালে রাজনীতিতে মানুষ হলে কি হবে অল্প বয়স থেকেই তানিজাকি পশ্চিমী হাবভাব-এর দিকে বিশেষ অনুরক্ত। নিজের লেখায় যেমন তেমনি জীবনের ক্ষেত্রেও এই ধারার প্রভাব বিশেষভাবে সক্রিয় থেকেছে।

টোকিওর রাজকীয় বিশ্ব বিদ্যালয়ে শাস্ত্রীয় জাপানী সাহিত্যে পড়া-শোনা। ছাত্রাবস্থায় আর কয়েকজন বন্ধু মিলে 'নব্য চিন্তাধারা' নামের এক

পত্রিকা প্রকাশ করেন। গোড়ার দিকের অনেকগুলি ছোটগল্প এই পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল, 'উল্কি' তাদের মধ্যে অন্যতম।

এই যুগের রচনায় ইয়োরোপীয় রোমান্টিক ভাবধারার প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। পো, বোদলিয়র, অস্কার ওয়াইল্ড প্রমুখেরা তানিজাকির রচনাকে রোমান্টিক ও নান্দনিক খাতে প্রবাহিত করতে সহায়তা করেন। এই সময়ে তানিজাকি নিষ্ঠুরতা, যৌন বিকৃতি ও আসুর বৃত্তি নিয়ে নাড়াচাড়া করছিলেন। জাপানী সমালোচকেরা তাঁকে শয়তানী ভাবধারার লেখক বলে চিহ্নিত করেন।

1923 সালের ভয়ঙ্কর ভূমিকম্পের সময় পর্যন্ত তানিজাকি টোকিওতে বসবাস করতেন। তারপর চলে যান কিয়োটোতে—এখানে আসার পর থেকেই জাপানের প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতির প্রতি তাঁর আকর্ষণ বাড়ে। এখন থেকে তাঁর রচনায় উদ্দামতা কমে স্বাভাবিক স্তিমিত ভঙ্গীতে স্থিত হয়।

1931 সালের পর থেকে তানিজাকি অনেকগুলি ছোট ছোট উপন্যাস লেখেন। এই রচনাগুলির বিষয় ও বিন্যাস সম্পূর্ণ জাপানী পরম্পরা সম্মত। তাই বলে প্রথম যুগের নান্দনিক অথবা নিষ্ঠুরতা প্রধান প্রভাব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত তিনি কখনোই হন নি।

তাঁর সাহিত্য কৃতির একটি মুখ্য অংশ হল একাদশ শতাব্দীর মহান শাস্ত্রীয় রচনা 'গেঞ্জি উপাখ্যান'-এর আধুনিক জাপানী ভাষায় দক্ষ রূপান্তর।

সিমেণ্টের পিপের মধ্যে একখানা চিঠি : হায়ামা ইয়োশিকি

মাৎসুদো ইয়োশিজো সিমেণ্টের পিপে খালি করছিল।

শরীরটা সিমেণ্ট মুক্ত রাখার চেষ্টাতে মোটামুটি সফল হলেও মাথার চুল আর গোঁফ ভরে গিয়েছিল পুরু ধূসর একটা প্রলেপে। নাকটা একবার খুঁটে নেওয়া বিশেষ জরুরী বোধ হচ্ছিল কেননা নাকের ফুটোর মধ্যে কেশগুলির উপর সিমেণ্ট জমে শক্ত হয়ে গেছে যেন রেইনফোর্সড কনক্রিট। কিন্তু সিমেণ্ট মিকসারটার প্রতি মিনিটে চাই উগরে দেবার জন্যে দশটি খোরাক যা ওকে যুগিয়ে যেতেই হবে নইলে কাজ ভণ্ডুল হবে।

কাজের সময়টা এগার ঘণ্টা। এর মধ্যে একবার ভাল করে নাক খোঁটা হয়ে ওঠে নি। খাবার ছুটির সময়টা খুব কম তখন এত খিদে পেয়েছিল যে গোগ্রাসে শুধু খাওয়াতেই মন দিয়েছিল। বিকেলের বিরতির সময়টা আরও কম। ভেবেছিল তখন নাকটা পরিষ্কার করে নেবে। কিন্তু সিমেণ্ট মিকসারটাই গেল জাম মেরে। সেটা আগে সাফ করতে হল। দিনের শেষ নাগাত মনে হচ্ছিল নাকটা বুঝি প্লাসটার অফ প্যারিস দিয়ে জমানো।

দিনটা শেষ হয়। ক্লান্তিতে হাত দুটো লটপট করছে। একটা পিপে নড়াবার জন্যে এখন দেহের সবটা শক্তিই বুঝি লাগছে। এমনিভাবে একটা পিপে কাৎ করতে গিয়ে দেখতে পায় সিমেণ্টের মধ্যে রয়েছে ছোট একটা কাঠের বাক্স।

'এটা কি ?' ভাবল একটু আবছাভাবে। কিন্তু কাজ থামিয়ে কৌতূহল মেটানো চলে না। বেলচা দিয়ে সিমেণ্ট তোল, সিমেণ্ট মাপার ফর্মাটা ভর্তি করো। ফর্মাটা তুলে সিমেণ্ট মেশানোর ডোঙাটার মধ্যে ফ্যালো। তারপর আবার বেলচা ঠ্যালো।

'একটুখানি রোসো দিকিন।' নিজের মনে আওড়ায়। 'সিমেণ্টের পিপের মধ্যে কাঠের বাক্স কেন থাকবে বলো দিকি ?'

বাক্সটা তুলে নিয়ে ওভার অল-এর পকেটে ও রেখে দেয়।

'হালকা একেবারে ফকফকে। কী আছে কে জানে! টাকা পয়সা যদি থাকে তো খুব বেশি হবে না।'

এইটুকু ভাবতেই ও পেছিয়ে পড়েছে। তাই বেলচা ঠেলতে হয় আরো খর খর। মিকসারটার সঙ্গে তাল রাখতে। যন্ত্রের মানুষের মত পাগলের বেগে ও পরের পিপেটা খালি করে সিমেন্ট ভরে চলে ফর্মাগুলোর মধ্যে।

খানিকবাদে মিকসারের ঘোরাটা শ্লথ হয়, তারপর থেমে যায়। মাৎসুদো ইয়োশিজোর আজকের মত ছুটি। মিকসারের সংলগ্ন রাবারের হোস পাইপের নলের মুখটা সরিয়ে নিয়ে মুখ হাত ধোবার একটা প্রাথমিক চেষ্টা করতে হয়। খাবারের কৌটোটা পিঠে বেঁধে নিজের আস্তানার দিকে এরপর পা চালায়। মনে এখন মুখ্য চিন্তা একটাই। কখন পেটে দুটো ভাত পড়বে কিংবা আরো জরুরী একভাঁড় ভাত পচানো পানীয়।

পাওয়ার প্লাণ্টটা ও পেরিয়ে যায়। এখানকার কাজ প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। শিগগিরই এ তল্লাটে বিদ্যুৎ এসে যাবে। দূরে সন্ধ্যার অন্ধকারকে ছাপিয়ে মাথা তুলে রয়েছে মাউন্ট কেইরার শৃঙ্গটা। ধপধপে শাদা তুষারের কোট তার গায়ে চড়ানো। এখন ওর ঘামে ভেজা শরীরের ভেতরে ঠাণ্ডা ঢুকছে, ভেতর থেকে একটা কাঁপুনি আসছে। যেখান দিয়ে ও যাচ্ছে তার পাশেই চলেছে কিসো নদীর ক্ষুব্ধ জলধারা। দুধের মতো ফেনা উথলে উঠে শব্দ উঠছে যেন কোন জানোয়ার গজরাচ্ছে।

'চুলোয় যাক!' মাৎসুদো ইয়োশিজো ভাবে। 'জাহান্নামে যাক। আর পারি না। মাগী আবার পোয়াতি।'

ওর মনে পড়ে ওর ছটি ছেলেমেয়ের কথা। ওদের ঝোপড়ির মধ্যেকার একখানি ছোট কামরার মধ্যে সারাক্ষণ চ্যাঁ ভ্যাঁ করে চলেছে। আবার এই শীতের মুখে আসছে আর একটা বাচ্চা। আর ওর বৌ একটার পর একটা বিইয়েই চলেছে। জানটা কয়লা করে দিল।

'রোসো দেখি একবার হিসেব করে; এক ইয়েন আর নব্বুই সেন হল



গিয়ে একদিনের মজুরী। তার থেকে কিনতে হবে রোজ দু পালি চাল—এক পালির দাম পঞ্চাশ সেন। রইল নব্বই সেন—জামাকাপড় ঘর ভাড়া সব মেটাও তাই দিয়ে। তাহলে এক ভাঁড় মালের পয়সাটা আমার জোটে কোথা থেকে বলো দিকি। চুলোয় যাক।'

হঠাৎ ওর মনে পড়ে যায় পকেটে ফেলে রাখা কাঠের বাক্সটার কথা। বার করে এনে ট্রাউজারের গায়ে পাছায় ঘসে মুছে নেয় লেগে থাকা সিমেণ্ট। বাক্সের গায়ে কোন কিছু লেখা নেই। বাক্সটা সম্পূর্ণ বন্ধ।

'ছোট বাক্স সিল করে রাখবে কেন। লোকটা যেই হোক রহস্য করতে দেখি খুব শখ।'

পাথরের ওপর সজোরে ঠুকল কিন্তু কই ঢাকনাটা তো খুলল না। বিরক্ত হয়ে মাটির ওপর আছড়ে ফেলে জুতোর নিচে থেঁতলালো। বাক্সটা ভেঙে গুঁড়িয়ে গেল। পাওয়া গেল ন্যাকড়া বাঁধা একটা চিরকুট। তুলে নিয়ে ও পড়া শুরু করলো ঃ

"আমি একটি মেয়ে। নরুমা-র সিমেণ্ট ফ্যাক্টরিতে কাজ করি। আমার কাজ হল সিমেন্টের ব্যাগ সেলাই করে মুড়ে দেওয়া। একটা ছেলেকে আমি ভালবাসতাম। সেও এই ফ্যাক্টরিতে কাজ করত। ক্রাশারের মধ্যে পাথর যুগিয়ে যাওয়া ছিল ওর কাজ। গত ৭ই অক্টোবর একটা বড় পাথর উঠিয়ে ফেলতে যাবার সময় কাদায় ওর পা পিছলে যায়। পাথরটার সঙ্গে ও পড়ে যায় ক্রাশারটার মুখের ভেতরে।

সঙ্গীরা ওকে টেনে বার করতে চেষ্টা করেছিল কিন্তু ও পড়ে যায় বড় পাথরটার তলায়। তাই ও পাথরের ভারে জলে ডুবে যাওয়ার মত তলিয়ে যায়। পাথরের সঙ্গে ওর দেহটাও চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে এক সঙ্গে বেরিয়ে আসে নলের মুখটা দিয়ে চ্যাপটা গোলাপী রঙের একখানা টালির মতো। সমস্তটা পড়ে কনভেয়ার বেলটের ওপর। সেখান থেকে পেঁছয় ময়দার মতো মিহি করবার যন্ত্রটার মধ্যে। সেখানে একটা বড় সিলিণ্ডার দিয়ে চূর্ণ পাথরকে থেঁতলানো হয়। ধুলো হয়ে যাবার সময় আমি যেন শুনতে পেলাম একটা

আর্তনাদ পাথরে মানুষে মিশে যাবার কালে। তারপর সেঁকা হয়ে গেলে ওর পরিণতি হয় চমৎকার একটা সিমেন্টের স্ল্যাবে।

ওর হাড় মাস মন প্রাণ সব কিছু হয়ে যায় ধুলো। হ্যাঁ, আমার ভালোবাসার জন শেষমেষ পুরোপুরি সিমেন্ট হয়ে গেল। পড়ে ছিল শুধু ওর ওভার অল থেকে খসে পড়া এক ফালি ন্যাকড়া। আজ আমি যে ব্যাগগুলো সেলাই করছি তার মধ্যে রয়েছে ওর দেহ মিশে যাওয়া সিমেন্ট। আমি এই চিঠিখানা লিখছি যখন তখন ও সিমেন্ট হয়ে গেছে। তাই এই ব্যাগের গায়ে ওই কাপড়ের টুকরোটা আমি সেলাই করে দেব।

তুমিও কি একজন মজুর? যদি হও তাহলে তোমার প্রাণে দয়া মায়া আছে তো? আমাকে একখানা চিঠি দেবে তো? এই পিপের সিমেন্টটা কোথায় ব্যবহার করা হয়েছে আমাকে জানাবে তো? আমার জানতে বড় ইচ্ছে করছে।

আচ্ছা, ও কতখানি সিমেন্ট হয়ে গিয়েছিল বলতে পারো কি? সবটা কি একই জায়গায় লেগে গেছে, নাকি নানান জায়গায়? তুমি কি দেওয়ালে পলেস্তারা ধরাচ্ছো না কি গাঁথনির কাজ করছ।

আমি সইতে পারব না যদি ও হয়ে যায় থিয়েটারের কিংবা বড় বাড়ির করিডর। কিন্তু না চাইলেই বা আমি ঠেকাচ্ছি কি করে বলো? তুমি যদি হও রাজমিস্ত্রি তাহলে এই সিমেন্টটা ওই কাজে লাগিও না।

আবার ভাবছি লাগালেই বা। কি আসে যায় তাতে। যেখানে তোমার মন চায় সেখানেই ওকে লাগাও। যেখানেই ও গাঁথা হয়ে যাক, গাঁথনিটা হবে মজবুত। মানুষটা ছিল বড় খাঁটি। যেখানে থাকুক, যা-ই করুক, করবে কিন্তু মন প্রাণ দিয়ে। তাতে ওর নিজের ভাগ্যে যাই ঘটুক না কেন।

স্বভাবটা ওর ভারি ভালো ছিল, বুঝলে। দেহটা মজবুত, গলার আওয়াজটা রুক্ষ হলে কি হবে। এখনো ছেলেমানুষ। সবে পঁচিশ পেরিয়েছিল। আমাকে কতটা ভালবাসত সেটা বুঝবার সময় দিল না গো। আর এই দেখ না আমি সেলাই করে চলেছি ওর কাফন খানা। মানে এই সিমেন্টের ব্যাগটা। চুল্লিতে না গিয়ে গেল কি না ঘূর্ণি ভাটিতে। কিন্তু

ওকে শেষ বিদায় জানাতে ওর সমাধিটা আমি কোথায় খুঁজে পাবো। কোথায় যে ও থাকবে গাঁথা হয়ে কি করে আমি জানব বলো দেখি। পূবে না পশ্চিমে কাছে না দূরে জানবার কোন উপায় নেই। তাইতো বলছি আমাকে একখানা চিঠি দিও। তুমি যদি একজন মজুর হও তাহলে ঠিক তুমি উত্তর দেবে, দেখে তো? তার বদলে আমি তোমাকে দেব ওর ছেঁড়া ওভারঅল থেকে একফালি ন্যাকড়া—হ্যাঁ, যে ফালিটা দিয়ে এই চিঠিখানা আমি বেঁধেছি। সেই পাথর গুঁড়ানো ধুলো, আর শরীর থেকে নিংড়ানো ঘাম মিশে আছে এই কাপড়ের ফালিতে। ওর ওভারঅলের এই ছেঁড়া টুকরোটাই তো আমার সম্বল—সেই ওভারঅলপরা শরীর দিয়ে আমাকেও জড়িয়ে ধরত। ওঃ কী দারুণ জোরে ও আমাকে চেপে ধরত ওর বুকে।

এইটুকু আমার জন্যে কোরো, করবে তো? হ্যাঁ, একটু কষ্ট হবে তোমার বুঝতে পারছি। কিন্তু আমাকে তারিখটা জানিয়ে দিও যেদিন এই সিমেণ্টটা কাজে লাগানো হল, আর কোথায় লাগল সেই জায়গাটার সঠিক ঠিকানাটা—আর তোমার নামটাও। আর তুমিও কাজ করবে খুব সাবধানে, বুঝলে? আচ্ছা, এবার বিদায়।

মাৎসুদো ইয়োশিজোকে ঘিরে বাচ্চাকাচ্চার চেঁচামেচি তীব্র হয়। চিঠির শেষে লেখা নাম ঠিকানার ওপর ও চোখ বুলিয়ে নেয়। চায়ের কাপ থেকে চুমুক দেয় ভাত পচানো পানীয়ে।

'মদ খেয়ে নেশা করে আমি চুর হব।' ও চেঁচিয়ে ওঠে। 'তারপর সব কিছু ভেঙে চুরমার করে দেব।'

'হ্যাঁ, তা আর করবে না?' ওর স্ত্রী বলল। 'পয়সাকড়ি সব মদ খেয়েই ওড়াতে হবে বৈকি। ছেলেমেয়েগুলো মরুক বাঁচুক তাতে তোমার কি?'

স্ত্রীর ঢাকের মতো পেটটার দিকে ওর চোখ পড়ল। মনে পড়ে সপ্তম সন্তান আসছে আর কয়েকদিন পরে।

লেখক পরিচিতি : হায়ামা ইয়োশিকি

লেখায় এবং জীবনচর্যায় হায়ামা ইয়োশিকি ছিলেন জনগণের প্রতিনিধি। 1894 সালে কিয়ুসুতে জন্ম। বাবা ছিলেন নীচু পদের সরকারী আমলা। বাল্যকালটা কাটে দারিদ্র্যে। বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ যদি বা ঘটল অনিয়মিত ক্লাসে যাওয়ার দরুণ বিতাড়িত হতেও দেরি হল না। তখন থেকে নানা পেশার মধ্যে দিয়ে জীবন সংগ্রাম। মালের জাহাজে কয়লা ঠেলা এর মধ্যে একটি। সর্বাধিক পরিচিত উপন্যাস 'সমুদ্রে বাস করে যারা' (1928) জাহাজের শ্রমিকদের অবর্ণনীয় দুর্দশারই প্রামাণ্য দলিল।

সমুদ্র ছেড়ে আসার পরে হায়ামা একটার পর একটা পেশার মধ্যে দিয়ে বিচরণ করে চলেন। যেমন ছাপাখানার ক্যানভাসার, ইস্কুলের কেরাণী, সিমেণ্ট ফ্যাক্টরির মজুর, জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রের অপারেটর।

1919 সাল থেকে শ্রমিক আন্দোলনে নেমে পড়েন। সেই বছরেই কারাবাসের হাতেখড়ি। এরপর থেকে কখনো জেলে কখনো বাইরে—এইভাবেই জীবনটা বয়ে চলে। বিশের দশকে, ত্রিশের দশকে নিষ্ফলা শ্রম আন্দোলন-এর নেতৃত্ব একই সঙ্গে চলতে থাকে। গল্প উপন্যাসগুলির বেশির ভাগই জেলে বসে লেখা।

প্রলেতারিয় স্কুলের লেখক গোষ্ঠীর পরিসীমাটা সংকীর্ণ হলেও হায়ামার রচনা প্রসাদগুণে বিশেষ সম্পন্ন। শ্রমিককে শহীদ বানিয়ে ভাবাবেগের বন্যা বহাতে তিনি চান না। বরং অল্পকথায় ঝরঝরে গদ্যে পাঠকের মনকে টেনে রাখেন এমন কি তখনও যখন স্পষ্টতই প্লটটা সাজানো-উদ্দেশ্য প্রচার। তবে রচনাগুলি অচিরেই কালচিহ্নিত হয়ে গেছে। এ যুগের পাঠকের মনে হবে প্রলেতারিয় সাহিত্যের প্যারডি বুঝি পড়ছি।

আলোচ্য গল্পটি প্রথম প্রকাশিত হয় 1926 সালে। তখন হায়ামির বয়স বত্রিশ বছর।

মেশিন : ইয়োকোমিৎসু রিইচি

প্রথম প্রথম আমার অবাক লাগত—বাড়ির মালিক পাগল নয় তো ? ওর ধারণা হল যে ওর ছেলে যার বয়স এখনো তিন বছর পুরো হয়নি সে নাকি ওকে দেখতে পারে না। নিজের বাপকে অপছন্দ করবার কোন অধিকার নেই কোন বাচ্চার, বিরক্তিতে ভ্রূকুটি করে মালিক ফতেয়া দিত। ভাল করে এখনো হাঁটতে শেখেনি, বাচ্চাটা হয়ত মুখ থুবড়ে পড়ে গেল। স্ত্রীর গালে পড়ল এক চড়—স্ত্রী কেন ওকে পড়ে যেতে দিল। তার তো লক্ষ রাখার কথা। আমাদের কাছে মানে বাকি সকলের কাছে এ এক মজার নাটক।

ওই মানুষটা কিন্তু যা বলছে, যা করছে সব আন্তরিকভাবে করছে ; তাই তো আমার মনে ভাবনা হত লোকটা পাগল নয় তো ?

চল্লিশ বছর বয়সের মানুষ, বাচ্চাটা এক মুহূর্তের জন্যে কান্না থামিয়েছে কিনা, অমনি তাকে কাঁধে তুলে ঘরময় পায়চারী। আর কেবল ছেলেটার সঙ্গেই যে ওর এই অদ্ভুত ব্যবহার তা নয়। ওর প্রত্যেকটা কাজেই যেন কেমন একটা অপরিণত মানসিকতা টের পাওয়া যায়। কারবারটা একটা কুটির শিল্প তাই স্বাভাবিক ভাবেই ওর স্ত্রীর রয়েছে মুখ্য ভূমিকা সুতরাং যারা তার দলের লোক তাদের প্রতিপত্তি একটু বেশিই হবে। এদিকে আমার যদি কারো সঙ্গে সম্পর্ক থাকে যতটুকুই হোক সেটা মহিলার স্বামীর সঙ্গে। আমার জন্যে তাই তোলা থাকে সেই সব কাজ যেগুলো অন্য কেউ করতে চায় না। কাজগুলো সত্যিই বিচ্ছিরি, ভারী নোংরা কাজ। কিন্তু কাজগুলো তো করতেই হবে না হলে কারখানাটাই যে বন্ধ হয়ে যাবে। এই দিক দিয়ে দেখলে আমার ভূমিকাটাই মুখ্য হয়ে ওঠে, মালিকের স্ত্রীরটা নয়। কিন্তু সে কথা আমি কারোকে বলি না—চুপচাপই থাকি। আমি লোকটা সেই দলের একজন যারা বিশ্বাস করে যে সবচেয়ে জঘন্য কাজটা দেওয়া হয় তাকেই যার দ্বারা আজ কোন কাজ হবে না।

তাহলেও, সবচেয়ে অপদার্থ লোকই কখনো কখনো কোন কোন কাজের পক্ষে খুব দরকারী লোক হয়ে ওঠে যখন সেই কাজটা অন্যদের পক্ষে হয়ত দুঃসাধ্য। আর নেমপ্লেট তৈরি করার কারখানায় যতগুলো রাসায়নিক প্রক্রিয়া আছে তাদের মধ্যে আমার ভাগের কাজটা ছিল নানাধরনের সাংঘাতিক বিষ নিয়ে নাড়াচাড়া। আমার ভাগের কাজটা ছিল এমন একটা খোপের কাজ যার মধ্যে অপদার্থ লোকদের সহজেই ঠেলে দেওয়া যায়। সেই খোপে একবার ঢুকে পড়ার পর থেকে দেখে আসছি আমার দেহের ত্বক, পরণের জামাকাপড় ফেরিক ক্লোরাইডের জ্বালাকর আক্রমণে কুঁকড়ে গুটিয়ে শুকিয়ে যাচ্ছে। বিষাক্ত ধোঁয়া আমার গলার মধ্যে যেন চিরে চিরে ঢুকত। রাতে আমার ঘুম হত না। অন্য কোন কাজের লোককে বোধ হয় এই খোপে ঢোকানো যেত না। আমার মনিব বোধ.হয় নিজের যৌবনে এই একটা কাজই শিখেছিল। আর তার কারণটা বোধহয় এই ছিল যে বাকি সব ব্যাপারেই তাকে অনুপযুক্ত বলে মনে করা হত।

আর এক কথা, আমিই কি ছাই ভেবেছিলাম যে এখানে আমি বেশিদিন পড়ে থাকব মানে একেবারে চলৎশক্তি রহিত হয়ে যাওয়া পর্যন্ত।

টোকিওতে আমি এসেছিলাম কিউশুর এক জাহাজের কারখানা ছেড়ে। ট্রেনে এক মহিলার সঙ্গে আলাপ হয়। বিধবা, বয়স পঞ্চাশের ওপর, ছেলে মেয়ে নেই, ঘর বাড়িও নেই। টোকিও যাচ্ছেন কিছুদিন আত্মীয়দের কাছে আতিথ্য নেবেন তারপরে একটা বোর্ডিং হাউস বা আর কোন ছোট-খাটো ব্যবসায় নামতে চান। আমি ঠাট্টা করে বলেছিলাম আমি যদি চাকরী পাই তাহলে ওঁর বোর্ডিং হাউসের একখানা কামরা আমি ভাড়া নেব। উনি বল্লেন ওঁর যে আত্মীয়দের কথা বলেছিলেন তাদের কাছে আমাকে নিয়ে যাবেন। তারা আমাকে চাকরী দেবে, সে সময় আমার সামনে অন্য কোন চাকরীর সম্ভাবনাও ছিল না। মহিলার ব্যবহারও বেশ আন্তরিক তাই মনে হয়েছিল ওর কথার ওপর নির্ভর করা যায়। তাই আমি তাঁর সঙ্গ ছাড়লাম না। শেষে পৌঁছলাম এখানে এই নেমপ্লেট তৈরির কারখানায়।

প্রথম প্রথম মনে হত কাজটা খুবই সহজ। তারপর আস্তে আস্তে দেখলাম যে রাসায়নিক গ্যাস আমার কর্মক্ষমতাকে কুরে কুরে খেয়ে নিচ্ছে। আজ ছেড়ে দেব, কাল ছেড়ে দেব—নিজের মনে মনেই বলি। আবার ভাবি এতদিন যখন রইলাম তখন কাজটার গোপন রহস্যগুলো শিখেই নেওয়া যাক। বিপজ্জনক রাসায়নিক বিক্রিয়াগুলোর বিষয়ে ভাল করে জেনে নেওয়ার আগ্রহ আমার বাড়তে থাকে।

আমার সঙ্গে কাজ করত একটা লোক, নাম কারুবে। ওতো ধরেই নিল যে আমি একজন গুপ্তচর, ব্যবসাটার গোপন তথ্যগুলো চুরি করতে এখানে সেঁধিয়েছি। মালিকের স্ত্রীর বাপের বাড়ির প্রতিবেশী ছিল ও। এই ব্যাপারটা ওকে দিয়েছিল কয়েকটা বাড়তি স্বাধীনতা—ও তাই হয়ে উঠেছিল বশম্বদ ভৃত্য। তাক থেকে যখনই আমি কোন বিষের বোতল নামাতাম কারুবে আমার দিকে কটমট করে তাকাতো। ডার্করুমটার আশে পাশে গেলেই সে দিক পানে চলে যাবে। বেশ শব্দ করে জানিয়ে দেবে যে ধারে কাছে ও আছে, সব কিছুর ওপর ওর নজর আছে। আমার কাছে এ সবই কেমন হাস্যকর ব্যাপার বলে মনে হত অথচ ওর এই একনিষ্ঠতা দেখে এক ধরনের অস্বস্তিও মনে মনে বোধ করতাম। ওর কাছে সিনেমার গল্প ছিল শ্রেষ্ঠ জ্ঞানের বই আর ডিটেকটিভ গল্পের কোন সিনেমা মানে তো জীবনের হুবহু দর্পণ। তার মনে হল আমি, যে কিনা ভবঘুরের মত এখানে এসে পড়েছি, ওর আজগুবি কল্পনার পক্ষে বেশ উপযুক্ত খোরাক। ওরও উচ্চাশা ছিল। চিরটাকাল এখানে কাটাতে আসে নি। কোন একদিন এমনি একটা কারখানার শাখা খুলে ফেলবে বলে ও নিশ্চয় ভাবত। তাই ও চাইত না যে লাল এনামেলের নেমপ্লেট তৈরির পদ্ধতিটা আমি শিখে ফেলি। লাল প্লেট আমাদের মালিকেরই উদ্ভাবন।

আমি শুধু চাইতাম কাজটা শিখতে—অধীত বিদ্যা ভাঙিয়ে জীবিকা অর্জনের কোন মৎলব আমার ছিল না। কারুবের মাথায় এতসব সূক্ষ্ম ভাবনা মোটেই খেলত না—আর সত্যি বলতে কাজটা একবার শিখে নিলে আমিই যে

এটাকে জীবিকা করে নেবার কথা ভাবব না সে কথা আমিও হলফ করে বলতে পারতাম না।

অন্তত আমার বিবেক একটু শান্ত থাকত যদি আমি নিজেকে আশ্বস্ত করতে পারতাম এই ভেবে যে আমার মৎলবটা যে কী এই চিন্তায় কারুবে একটু উত্যক্ত হচ্ছে। এতদূর পর্যন্ত ভাবনা চিন্তা করে, ওর কথা মন থেকে সরিয়ে ফেলেছিলাম।

আমার সঙ্গে বৈরিতা কিন্তু ওর বাড়তেই লাগল। আমি ওকে নিরেট বোকা বলে লোকের কাছে বলে বেড়াচ্ছিলাম। হলে কি হবে যতই কেন ওকে বোকা বলে ধরে নিই, আসলে বোধহয় ও ততটা বোকা ছিল না। তা এমন একজন মাগনা পেয়ে যাওয়া শত্রুকে নিয়ে তামাশা মন্দ মজা নয়। পরিস্থিতি যতদিন এরকম চলে চলুক না। কিন্তু এই মজাটা চলতে চলতে অনেকদিন কেটে গেল পরেই আমি ধরতে পারি যে আমার সুরক্ষার বর্মে একটা ফাঁক ছিল। আমি হয়ত একটা চেয়ার ধরে টানলাম কিংবা শান দেবার জন্য একটা যন্ত্র ঘোরাতে গেলাম কোথা থেকে একটা হাতুড়ি পড়ে যায় আমার মাথা ঘেঁসে। কিংবা প্লেট তৈরির জন্য ঘসে মেজে রাখা একরাশ পেতলের চাদরের টুকরো হুড়মুড় করে পড়ল আমার পায়ের ওপর। যেটাকে ভেবেছিলাম নিরাপদ বার্নিশ কিংবা ইথারের বোতল—কেমন করে কে জানে সেটা হয়ে যায় ক্রোমিক অ্যাসিড। প্রথম প্রথম ভাবতাম আমিই বুঝি অসাবধান। তারপর যখন ধরে ফেললাম যে এসবের জন্যে কারুবেই দায়ী তখন বুঝলাম যে সাবধান না হলে কোনদিন মারাই পড়ে যাব। তখন আমার হাড়ের ভেতরটা পর্যন্ত হিম হয়ে গেল। বোকা হলে কি হবে বয়সে কারুবে আমার থেকে অনেক বড়ো। বিষ মেশানোতেও বেশ পোক্ত। ও জানত যে কারো চায়ের মধ্যে অ্যামোনিয়াম ডাই ক্রোমেট মিশিয়ে দিলে তার ফলটা আত্মহত্যা বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে। খাবারের মধ্যে হয়ত হলদে কিছু চোখে পড়ল, ব্যস ওই বুঝি ক্রোমিক অ্যাসিড। আমার হাত আর ও দিকে এগোবে না। তবে কিছু দিন যেতে মনে হল এত সাবধানতা অর্থহীন। খুন করতে চায় তো



করুক, কাজটা যদি এতই সোজা হবে। তার পর আবার ওর কথা ভুলে গেলাম।

একদিন কারখানায় কাজ করছি এমন সময় মালিকের স্ত্রী এসে আমাকে বলল যে তার স্বামী বাজারে যাবে পেতলের চাদর কিনতে তাই আমাকে সঙ্গে যেতে হবে। টাকাকড়ি সামলাবার ভার আমার ওপর। নিজের কাছে রাখলে মালিক নির্ঘাত টাকাকড়ি হারিয়ে ফেলবে। মালিকানের ভাবনা হল তার স্বামীর হাতে টাকাকড়ি যেন না থাকে। সত্যি কথা বলতে আমাদের এখানে যত গোলমাল তার প্রধান উৎসটা ছিল মালিকের এই বিশেষ দুর্বলতা। কারো মাথায় আসত না কিভাবে মালিক টাকা পয়সা হাতে পেলেই হারিয়ে ফেলত। একবার হারালে তো আর সে টাকা ফিরে আসবে না তাই নিয়ে যতই বকাবকি করো না কেন। কিন্তু যে টাকার জন্যে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে এত খাটাখাটুনি সেই টাকা যদি জলের ওপর থেকে বুদ্বুদের মত মিলিয়ে যায় তাহলে আপত্তি জানাতেই হয়। দু একবার হলে এক কথা কিন্তু হামেশা এই একই বৃত্তান্ত। মালিকের হাতে টাকা পড়লে সে টাকা হারাবেই। আসলে এই কারবারটার ব্যাপার স্যাপার অন্যান্য কারখানা থেকে একেবারেই আলাদা। চল্লিশ বছর বয়সের একটা লোক টাকা হাতে নিল আর দেখ্ বলতে হারিয়ে ফেলল—অবাক লাগে কেমন করে এমনটা ঘটতে পারে। মালিকের বৌ ওর পয়সার ব্যাগটা গলায় বেঁধে সার্টের পকেটে গুঁজে দিত। কিন্তু হলে কি হবে ব্যাগ বাঁধা থাকত যেমন কে তেমন, পয়সা কোথা দিয়ে উধাও হয়ে যেত। হয়ত ব্যাগ থেকে কিছু বের করতে গেলে টাকাগুলো পড়ে যেত। কিন্তু ও কি কখনো দেখত না টাকাগুলো রইল কি পড়ে গেল! এতবার করে ওর টাকা কেবলই হারিয়ে যাচ্ছে একথা কি বিশ্বাস করা যায়? এ ঠিক ওর বৌ-এরই একটা চাল। আমাদের মাইনে দিতে দেরি করার ফন্দী।

বেশ কিছুদিন ধরে আমার মনে এমনি সব ভাবনা খেলত—তারপর মালিকের হাবভাব আচার আচরণ থেকে আমি নিশ্চিত হতাম যে ওর বৌ-এর কথাই ঠিক। বড় লোকদের সম্বন্ধে বলা হয়ে থাকে যে তারা নাকি পয়সা

যে কী বস্তু তা-ই চেনে না—তা আমাদের মালিক একদিক দিয়ে দেখতে গেলে কতকটা সেইরকম। সাধারণ স্নানঘরে স্নান করবার দক্ষিণা পাঁচ সেনই বা কি আর পেতলের চাদর কেনবার জন্যে এক থলে টাকাই বা কি মালিক আমাদের দুটো ব্যাপারেই ভোলানাথ। ইতিহাসের একটা যুগ গেছে যখন হয়ত আমাদের মালিককে সাধুসন্ত আখ্যা দেওয়া যেত। কিন্তু সাধু-সন্তদের নিয়ে যাদের ঘর বসত করতে হয় তাদের হুঁশিয়ার থাকতে হয়। কোন কাজ মালিকের ওপর ছেড়ে দেওয়া চলত না—যে কোন কাজ তিনি একলা অনায়াসে করতে পারেন সেটার জন্যে দুজন লোককে সঙ্গে যেতে হবে। ওই একটি লোকের জন্যে কত বাড়তি খাটুনি যে খাটতে হত সে আর কী বলব। এ সব কথাই সত্যি। তবুও জায়গাটা আরো অনেক কম সহনীয় হত যদি ওই একটি লোক না থাকত। কারবারটার নিন্দে মন্দ অনেকেই করত কিন্তু মালিককে নিয়ে নয়। অনেকেরই ভাল লাগত না স্ত্রীর কাছে ওর অমন চাকর বাকর ভাব কিন্তু লোকটা এতই ভালমানুষ আর নিজের ব্যাপারে এতই দীন আর বিনীত ভাব যে মানুষজন তাতে খুশিই থাকত। আর স্ত্রীর শাসানো দৃষ্টির নাগাল থেকে কখনো সখনো মুক্তি যদি পেত তখন খাঁচা ছাড়া খরগোসের মতন ছুটোছুটি করে টাকা পয়সা দিগ্বিদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে দিত।

তাই আমাকে মানতেই হবে যে কারবারটার হৃৎপিন্ড আসলে মালিকান, বা কারুবে কিংবা আমি—আমরা কেউই ছিলাম না। আমি তো মালিকের ফাইফরমাশ খাটা চাকর, মালিককে মান্যিগন্যি তো করতেই হবে কিন্তু মালিক বলে নয় মানুষটাকেই কেন যেন আমার ভাল লাগত। লোকটা কেমন ছিল সেটা কল্পনায় আনতে হলে ভাবতে হবে একটা শিশুর কথা ; এই ধরুন পাঁচ বছর বয়সের একটা শিশু কেমন করে যেন চল্লিশ বছর বয়সের একজন প্রবীণ লোক হয়ে গেছে। এমন একজন লোকের কথা ভাবতেই যেন পারা যায় না। আমরা দেখাতে চেষ্টা করতাম আমাদের বুঝি মালিকের থেকে বুদ্ধি বেশি কিন্তু পারতাম কই। আমাদের বয়সই বেড়ে ছিল আর সেটাই প্রকাশ

হয়ে পড়ত। (এ সব শুধু আমার একলারই চিন্তার বিষয় ছিল না। কারুবের মাথায়ও এই সব ভাবনা চিন্তা খেলত বোধ হয়। পরে আমার মনে হয়েছে আমার প্রতি ওর বৈরিতার প্রকাশ ওর হৃদয়বত্তার কারণেই, মনিবের স্বার্থকে বাঁচিয়ে রাখার তাগিদ থেকেই উদ্গত হত)। এই যে এই কারখানার চাকরী ছেড়ে চলে যেতে পারছিলাম না সেটাও মালিকের সহৃদয়তার কারণেই। আর আমার মাথার ওপর হাতুড়ি খসে পড়া আদি ঘটনাগুলোর উৎসও ওই একই কারণ থেকেই খুঁজতে হবে। দেখা যাচ্ছে সততার অভিব্যক্তি নানাবিধ রূপ দিতে পারে।

তা, মালিক আর আমি তো বেরোলাম সেদিন পেতলের চাদর কিনতে। পথে যেতে যেতে মালিক বললেন সেদিন সকালেই নাকি তিনি একটা লোভনীয় প্রস্তাব পেয়েছেন। পঞ্চাশ হাজার ইয়েন দর দিয়েছে একজন লোক লালপ্লেট তৈরির পদ্ধতিটা বিক্রি যদি করেন। আমাকে শুধালেন আমার কী মনে হয়, বেচা উচিত কি না? আমি কোন উত্তর দিতে পারি নি। তিনি তাই বলে চললেন: বেচার প্রশ্ন উঠতই না যদি পদ্ধতিটা চিরটা কাল ধরে গোপন রাখা যেত কিন্তু প্রতিযোগী ব্যবসাদারেরা উঠে পড়ে লেগেছে—বেচতে হলে এই হল মওকা।

হয়ত সে কথা ঠিকই। কিন্তু আমার মনে হল আমার এ ব্যাপারে কোন মতামত দেবার অধিকার নেই বিশেষ করে যে পদ্ধতিটা নিয়ে মনিব এতকাল ধরে এত পরিশ্রম করে এসেছেন সেটা বেচে দেবেন এ কথায় আমি সায় দেব কেমন করে। আবার যদি বলি আপনার যা ভালো মনে হয় তাই করবেন তাহলে নির্ঘাত উনি বৌ যা বলবে তাই করবেন। আর বৌ-এর তো চোখের সামনে যা দেখছে তার বাইরে চিন্তা করবার ক্ষমতাই নেই।

আমার মনে হত ওঁর জন্যে নিজের যথাসাধ্য করে যাই। এই ভাবনাটা যেন সর্বদাই মনের মধ্যে ছেয়ে থাকত। যতক্ষণ কারখানায় থাকতাম কেবলই মনে হত সবগুলো পদ্ধতি যেন আমার অপেক্ষায় রয়েছে। কেমন করে সুশৃঙ্খলায় তাদের চালাতে পারি, সমস্ত মালমশলা কেমন করে ঠিক ঠিক যুগিয়ে চলি।

মনে হত কারুবে একটা চাকর,আরও মন্দের কথা ওর নাটুকেপনা আমার ভারি অসহ্য লাগত। কিন্তু ইতিমধ্যে আমার ভাবনা আর একদিকে মোড় নিয়েছে। আবার আমি লক্ষ করা শুরু করেছি কারুবে কেমন করে আমার প্রতিটি সামান্যতম কাজকর্মের ওপরেও নজর রাখছে। আমি যখন কোন কাজ করি ওর চোখের দৃষ্টি অন্য কোন দিকে বোধ হয় একবারও ফেরায় না। পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে মনিবের বৌ ওকে জানিয়ে রেখেছে ওর স্বামীর বর্তমান গবেষণার ব্যাপারটার কথা, লাল প্লেট তৈরির পদ্ধতিটার কথা। আমার ওপরে নজর রাখতে হবে সেটাও বৌ-এর নির্দেশ কিনা সেটা অবশ্য আমি বলতে পারব না। তবে আমার চিন্তা শুরু হয়েছিল যে কারুবে আর মনিবের বৌ কোন একদিন লাল প্লেট তৈরির গোপন পদ্ধতিটা না চুরি করে পালায় তাহলে আমিই বা কেন একটু নজর রাখা শুরু না করি। তাই আমার নিজের মনের মধ্যে কোন দ্বিধা ছিল না যে ওরা দুজন মনে মনে আমার প্রতি ঠিক একই সন্দেহ পুষে রেখেছে। যখন সন্দিগ্ধ চোখে ওরা আমার দিকে তাকাত তখন একটু অস্বস্তি লাগত ঠিকই কিন্তু মনে মনে বেশ মজাও পেতাম। ভাবতাম দেখছ কি বাছাধনেরা আমিও নজর রাখছি তোমাদের ওপর।

তাঁর নতুন গবেষণার কথা মনিব আমাকে জানালেন যখন তখন অবস্থাটা এমনি চলছে। অনেকদিন ধরেই উনি একটা উপায় খুঁজছিলেন যার ফলে ফেরিক ক্লোরাইড ছাড়াই পেতলের উপরিতলে দাগ ধরানো যাবে। এতকাল কোন সন্তোষজনক উপায় খুঁজে পান নি। আমাকে বলেছিলেন অন্য কাজের ফাঁকে একটু সাহায্য ওঁকে করতে পারি কিনা। যতই ভালোমানুষ হোন না কেন, এমন একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের তথ্য আমার কাছে প্রকাশ করা ওঁর উচিত হচ্ছে না—আমার মনে হল। তথাপি, উনি আমার ওপর বিশ্বাস রাখছেন, ব্যাপারটা আমার হৃদয়কে স্পর্শ করলো। তখন আমার মনে হয়নি বিশ্বাসের মর্যাদা যাকে রাখতে হয় শেষ পর্যন্ত লোকসান তারই হয়। তা এইভাবে মনিবের কাছে বারবার আমরা হেরে যেতাম। এই যে নিপাট ছেলে-মানুষীপনা—এটা যে কেউ অর্জন করতে পারে না—এই গুণের জন্যেই

লোকটার দাম। অন্তর থেকে মনিবকে ধন্যবাদ জানালাম, বললাম আমার যতটুকু সাধ্য আমি করবো।

ভাবলাম আমার জীবনেও কি তেমন দিন কোনদিন আসবে না যখন হয়ত আর কেউ আমাকে অন্তর থেকে ধন্যবাদ জানাচ্ছে। কিন্তু আমার মনিবের মাথায় তেমন ছোটখাট ভাবনা কখনো খেলত না 'কে কী করছে বা করিয়ে নিচ্ছে'—তাই তাঁর কাছে আমার মাথা আপনা থেকেই হেঁট হয়ে আসে। তাঁর কাছে আমার সম্মোহিতের অবস্থা। আমি দেখলাম অঘটন বাইরে থেকে কেউ ঘটায় না—অঘটন ঘটে যায় নিজেদেরই অসংগতি থেকে। আমার কাছে যেমন তেমনি কারুবের কাছেও সবার আগে হলেন মনিব। মনিব গিন্নির ওপর আমার বিদ্বেষ জন্মাতে থাকে কেন উনি মনিবকে শাসন করবেন। এমন ভাবনা মনে জাগত যে এমনি একটা মানুষের দখলদারী কেন একটা মেয়েছেলে করবে কেবল তাই নয় মাঝে মাঝে মনে হত বৌ-এর তদারকী থেকে মনিবকে কী করে মুক্ত করা যায়। কারুবে কেন আমার ওপর খড়্গহস্ত সেটা বেশ ভাল মত বুঝতে পারি। ওর মধ্যে আমি নিজেকে বেশ স্পষ্ট দেখতে পাই আর এই রহস্যের উদ্ঘাটন থেকে বেশ আহ্লাদ জাগে মনে মনে।

একদিন মনিব আমাকে ডেকে নিয়ে গেলেন ডার্করুমের ভেতরে। ওঁর হাতে ধরা ছিল অ্যানিলিনের প্রলেপ লাগানো এক টুকরো পেতলের প্লেট। স্পিরিট ল্যাম্পের শিখার ওপরে সেটা ধরে উনি আমাকে বুঝিয়ে বলছিলেন। প্লেটে রং ধরাতে হলে খুব ভাল করে নজর রাখতে হবে আগুনের আঁচ-এর প্রভাবে পরিবর্তন কখন কেমন ঘটছে।……

পেতলের চাদরটার রং এখন বেগুনী। একটু পরেই ওটা হয়ে যাবে কালচে বাদামী শেষে যখন একেবারে কালো হয়ে যাবে তখন দেখা যাবে যে পরের পরীক্ষাটাতে ফেরিক ক্লোরাইডের সঙ্গে রাসায়নিক বিক্রিয়াতে ওটা লিপ্ত হচ্ছে। রং ধরাবার মোদ্দা কথাটা হল, মনিব বললেন, একটা রাসায়নিক পরিবর্তনকে ঠিক মাঝপথে ধরে ফেলার কায়দাটা আয়ত্ত করা। এরপর মনিব আমাকে যতগুলো সম্ভব রাসায়নিক দ্রাবণ নিয়ে তাপ ধরাবার পরীক্ষাটা

চালিয়ে যেতে বললেন। আমার তো নেশা ধরে গেল। কত রকমের মৌল আর যৌগের মধ্যে কত বিচিত্র জৈবিক সম্পর্ক লক্ষ করলাম। অজৈব রাসায়নিক পদার্থের মধ্যে এমন সূক্ষ্ম প্রাণচাঞ্চল্য যতই দেখি, আমার আগ্রহ ততই বাড়তে থাকে। ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বস্তু-কণার মধ্যেও এমন নিয়মের নিগড়, এমন নির্ভুল যন্ত্র ব্যবস্থা দেখতে দেখতে আমার ভেতরে যেন একটা আত্মিক অভ্যুত্থানের সূচনা হয়।

কারুবে যখন দেখল ডার্করুমে আমি অবাধে যাওয়া আসা করছি (এর আগে আর কারোকে ডার্করুমে যেতে দেওয়া হয় নি) তখন ওর হাবভাবের আচরণের পরিবর্তন ঘটাল। ও নিশ্চয় ভাবছিল, আমার ওপর এমন সতর্ক পাহারাদারী সব মিথ্যে হয়ে গেছে। যেখানে ঢোকার অনুমতি ও নিজে পায়নি— ও, যে কিনা কেবল মনিবের কথাই ভেবে এসেছে—সেখানে আমার এমন অবাধ গতি – আমি যে কিনা এসেছি এই সেদিন।

তার ওপর এখন থেকে সাবধান না হলে কবে ওকে সম্পূর্ণ আমার হাতের মুঠোয় এসে পড়তে হয়। আমি জানতাম এখন থেকে আমাকে সবদিক ভেবে চিন্তে সব কাজ করতে হবে। কিন্তু কারুবে কে ? যে আমি কি করবো বা না করবো সে জন্যে ওর কথা ভাবতে হবে ? ওর জন্যে আমার কোন সমমর্মিতা ছিল না। ছিল কেবল একটা ঠান্ডা অনাসক্ত আগ্রহ। গর্দভটা এর পরে কী করে বসে তাই নিয়ে। ওর প্রতি আমার ভাবনাখানা ছিল একটা নাক উঁচু উপেক্ষার ভাব।

এতে ও আরো খেপে গেল। একদিন আমার একটা পাণ্ডের দরকার। পাণ্ডটা নিয়ে ও কাজ করছিল খানিক আগে। সেটা এখন উধাও। কোথায় গেল ? ও কি পাণ্ডটা নিয়ে কাজ করছিল না ! পাওয়া যাচ্ছে না, ওর জবাব। কাজ করুক বা না করুক তাতে কী এসে যায়। আমিতো খুঁজে দেখতে পারি। ঠিক কথা। কিন্তু খুঁজে খুঁজে হয়রান হয়ে গেলাম পাণ্ডটা আর পাওয়া যায় না। তখন আমার চোখ পড়ল ওর পকেটের দিকে, ওইতো পাণ্ডটা রয়েছে। কোন কথা না বলে ওর পকেটের দিকে হাত বাড়াই। না বলে কয়ে

পরের পকেটে হাত ঢোকাবার কে আমি—ও জানতে চায়। পরের পকেটে? বটেই তো, আমি বলি। যতক্ষণ কারখানার ভেতরে আছি ততক্ষণ সবার পকেট সকলের। ওটা আমার নিজের মনগড়া মত—ও বললো। হবেই তো—গোপন কথা, লুকানো রহস্য চুরি, তা না হলে যে করা যাবে না।

'কবে আমি কী চুরি করলাম? মনিবের কাজে সাহায্য করার মানে যদি চুরি করা হয় তাহলে তুমিও চুরি করছ বলব তো?' আমি শুধাই।

কথাটা শুনে ও চুপ করে রইল খানিকক্ষণ। ওর ঠোঁট দুটো থর থর করে কাঁপছিল। তারপর ওর গলা থেকে তোৎলামির ঝোঁকে আওয়াজ বেরোয়, 'বেরিয়ে যা। কারখানা থেকে এক্ষুনি দূর হয়ে যা।'

'ঠিক আছে। আমি চলে যাবো। তবে মনিবের নুন খেয়েছি তাই তাঁর অনুসন্ধানটা ভালভাবে কতটা এগোয় সেটা দেখে যাবো।'

'বেশ তাহলে আমিই চলে যাবো।'

আমি ওকে নিরস্ত করতে চাইলাম। 'তুমি শুধু গোলমাল বাধাবে। বরং একটু সবুর করো আমিই আগে চলে যাই।'

কিন্তু ও নিজেই চলে যাবে বলে জেদ করতে থাকে।

'বেশ তো যাও না। আমি একাই দুজনের কাজ সামলাতে পারব।'

ওর হাতের কাছে ছিল চুনের ঢিবি। এই কথা শুনে ও একমুঠো চুন তুলে নিয়ে আমার মুখে ছুঁড়ে মারলো।

আমি জানতাম দোষটা আমারই কিন্তু দোষের কাজ করার একটা মজাও আছে। ওর ধৈর্য হারানোর ব্যাপারটা আমার বুঝতে একটুও অসুবিধে হল না—একটা ভালো মানুষের অন্তরটাকে বিষিয়ে দিলে এমনি ভাবেই তার ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠার কথা। এই মজাটা বেশ মৌজ করে উপভোগ করতে মন চায় আবার এটাও জানি যে সেটা করা চলবে না। তাই ওকে একটু শান্ত করতে উদ্যত হই। ওকে উপেক্ষা করাটা আমার ভুল হয়েছে। কিন্তু ওর রাগের প্রত্যেকটা ঢেউয়ের কাছে মাথা নত করবার মানুষ আর যেই হোক আমি নই। যত নীচু হবে ততই দেখবে অন্য লোকে তোমার ওপর আরো বেশি রেগে যাচ্ছে।

কারুবের উষ্মা শনৈ শনৈ যতই বাড়তে থাকে ততই আমার নিজের কাছে স্পষ্ট হয় আমি কত ছোট হয়ে যাচ্ছি ওর কাছে। নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারায়নি এমন করে এর আগে কখনো। কথায় বলে শরীরের মাপেই মন বড় বা ছোট হয়ে থাকে। চুপ করে ভেবে ভেবে বুঝতে পারি আমার মনটা সত্যিই আমার ছোটো খাটো দেহের সঙ্গে ঠিক খাপ খেয়ে যাচ্ছে।

খানিক পরে আমি ডার্করুমে গেলাম। বিসমাথ ঘটিত একটা রংকে দ্রবণ থেকে দানা বাঁধাতে হবে। তাই একটা টেস্ট টিউবে পটাশিয়াম ক্রোমেট নিয়ে উত্তপ্ত করা শুরু করে দিলাম। এটাও আমার একটা ভুল পদক্ষেপ। ডার্করুমে যাওয়া আসা থেকেই কারুবেই আমার ওপর এত হিংসের উৎপত্তি— আর ঠিক এক্ষুনিই আবার আমার সেই ডার্করুমে আসা। ও রাগে একেবারে ফেটে পড়ল। দরজাটা দড়াম করে খুলে ও আমার কলার ধরে টেনে বের করে আনল তারপর ধাক্কা মেরে মেঝের ওপর ফেলে দিল। আমি বাধা দিলাম না। আমার মত মানুষ মারধর জোর জুলুমেই টিট থাকে। ডার্করুমের চারদিকটায় একবার চোখ বুলিয়ে দেখে নিল পটাশিয়াম ক্রোমেট চলকে পড়েছে কিনা—দেখতে গিয়ে কামরাটা এক পাক ঘুরেও নিল। ফিরে এসে মেঝেয় পড়ে থাকা আমার সামনে এসে চোখ পাকিয়ে দাঁড়ালো। কামরাটা এক পাক ঘুরে এসে ওর রাগ মোটেই পড়েনি। এর পরে কী করবে তাই ওর চিন্তা। আমি একটু নড়ে উঠলেই হয়ত লাথি মারবে ভাবছিল। মুহূর্তকাল আমার মনে হল আমি কী করছি—তারপর আমি ভাবতে লাগলাম আমি যেন স্বপ্ন দেখছি। মনে হল আমাকে নিয়ে রাগে উন্মাদ হয়ে ও কী করে দেখাই যাক না—যতক্ষণে আমি দেখলাম ওর রাগ চড়তে চড়তে চূড়ান্ত পর্যায়ে উঠেছে, মনে তখন বেশ নিশ্চিন্তি এল। নিজের দিকে ফিরে দেখলাম কতটা ধকল গেছে দেহটার ওপর দিয়ে। মুখের মধ্যে কানের ভেতরে চুনের ডেলাগুলো করকর করছিল। উঠে পড়ব কিনা ঠিক করতে পারছিলাম না। আমার নাকের সামনে পড়ে থাকা কেটে রাখা অ্যালুমিনিয়ামের টুকরোগুলোর স্তূপটাকে দেখে ভাবছিলাম অবাক হয়ে, তিনদিন কত কাজ করে ফেলেছি!

'বোকামি ঢের হল, এবার কাজে লেগে যাওয়াই ভাল,' বললাম, 'এই এত অ্যালুমিনিয়ামে রং ধরাতে হবে।'

ফের কাজ শুরু করার মেজাজ তখন কারুবের মোটেই নেই। 'তার চেয়ে বরং তোর মুখে রং ধরিয়ে দিই।'

অ্যালুমিনিয়ামের টুকরোগুলোর মধ্যে আমার মাথাটা গুঁজে দিয়ে আমার মুখখানা আচ্ছা করে তার মধ্যে ডাইনে বাঁয়ে রগড়ে দিল যেন ওগুলো ধাতুর টুকরো নয়—ছাড়া কাপড়ের পুঁটুলি। আমার মনে হচ্ছিল কে বুঝি আমার মুখখানা পালিশ করছে :বাড়ির দরজায় লাগানো একরাশ নেমপ্লেটের পাহাড় দিয়ে। মনে হচ্ছিল সহিংস মনোভাব কত বিপত্তির সৃষ্টি করতে পারে। অ্যালুমিনিয়ামের কোণাগুলো আমার মুখের খাঁজ আর গর্তগুলির মধ্যে বিঁধে যাচ্ছিল। আরো খারাপ লাগছিল যখন শুকিয়ে আসা রং আমার মুখের চামড়ার সঙ্গে আটকে যাচ্ছিল। কিছুক্ষণের মধ্যে আমার মুখখানা ফুলে উঠল। আমার মনে হল আমার ডিউটি তো পুরো হল এবার তাহলে ডার্করুমে যাওয়া যাক, তাই সেদিকে পা বাড়ালাম। তখন কারুবে আমার একখানা হাত মুচড়ে পিঠের ওপর পাকিয়ে ধরে আমার মুখখানা কাঁচের জানালায় চেপে ধরল—ভাবখানা কাঁচের সার্শির ওপর ঠুকে দিয়ে মুখের ওপর কাঁচগুলো ভাঙবে।

এমন নিষ্ঠুরতা বেশিক্ষণ চলতে পারে না—আমি ভাবছিলাম। কিন্তু না, চলতেই থাকল। দোষ যদিও অনেকাংশে আমারই, কিন্তু সেজন্য আমার মন থেকে অনুশোচনার ভাব ক্রমে ক্রমে মিলিয়ে যাচ্ছিল। আমার মুখের ভাব গোড়া থেকেই ছিল ভিতু ভিতু, সব মেনে নিচ্ছি এই ধরনের। এখন সে মুখ ফুলে উঠে যন্ত্রণায় বীভৎস, তাই আরো সহিংসতার অজুহাত পাওয়া যায়। আমি বেশ বুঝতে পারছিলাম কারুবে ওর ক্রোধথেকে এখন আর কোন আনন্দ পাচ্ছে না কিন্তু সেই ক্রোধকে সংবরণ করা এখন ওর আয়ত্তের বাইরে।

আমাকে যখন ও টেনে নিয়ে যাচ্ছিল একটা খুব বিষাক্ত আর জ্বালাকর ত রল-গোলা গামলার দিকে, তখন আমি ওকে বললাম, 'আমাকে কষ্ট দেবে

তা দাও, সেটা তোমার ব্যাপার কিন্তু ডার্করুমে যে পরীক্ষাগুলো আমি করছি সে ধরনের পরীক্ষা কেউ কখনো করেনি এর আগে। পরীক্ষাগুলো সফল হলে লাভ যে কত হবে সেটা কেউ ভাবতেই পারবে না। তা তুমি আমাকে কাজ করতে দিলে না আর ওই তরলটা উল্টে ফেলে দিলে তো—যেটা আমি কতদিন ধরে খেটে খুটে বানিয়েছিলাম। জায়গাটা সাফ করিয়ে ফেল।'

'তাহলে তুই আমাকে কেন তোর সঙ্গে কাজ করতে দিস না!'

আমি ওকে বলে বোঝাতে পারি না যে সেই সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা আমার হাতের বাইরে—বলতে পারি না যে তুমি একঠা রাসায়নিক ফর্মুলা পড়তে পারোনা, তোমাকে দিয়ে সাহায্যের বদলে বিঘ্নই ঘটবে। আমার তরফ থেকে কাজটা একটু হৃদয়হীন হলেও ওকে আমি ডার্করুমে নিয়ে গেলাম ছোট ছোট অক্ষরে লেখা সারি সারি রাসায়নিক সমীকরণে বদ্ধ সূত্রগুলো দেখিয়ে ওকে বুঝিয়ে দিতে চাইলাম।

বললাম, 'তোমার ভাল লাগলে ওই ফর্মুলার হিসেব মত অঙ্ক কষে কষে তুমি উপকরণগুলো মিশিয়ে যাও—একবার নয় বার বার; এখনই শুরু করে দাও—আমার জায়গায় তুমিই না হয় রোজ এই কাজটা করো—একদিন নয় রোজই।' এই প্রথম আমি ওকে যেন বাগে পেয়েছি বলে বোধ হতে লাগল।

মারপিটের পর থেকে কয়েকটা দিন আমার একটু স্বস্তিতে কাটলো। তারপর হঠাৎ কারুবে আর আমি খুব ব্যস্ত হয়ে পড়লাম। মিউনিসিপ্যাল অফিস থেকে আমাদের কারখানা একটা বড় অর্ডার পেল—একটা গোটা শহরের সব নেমপ্লেট তৈরি করে দিতে হবে—পঞ্চাশ হাজার নেমপ্লেট দশ দিনের মধ্যে।

মালিকের বৌ খুব খুশি—আমরা বুঝতে পারলাম আমাদের এই কদিন রাতে আর ঘুমোতে হবে না। মনিব অন্য একটা নেমপ্লেটের কারখানার একজন কারিগরকে নিয়ে এলেন কাজটা সামাল দিতে। কাজের চাপে প্রথম প্রথম আমি দিশাহারা হয়েছিলাম। তবে কয়েকদিন বাদে আমি ইয়াশিকি মানে নতুন লোকটার হাবভাবে অন্যরকম কিছু লক্ষ করলাম। আমার সন্দেহের কথা যদি প্রকাশ করি তাহলে কারুবে না জানি কী করে বসবে—তাই ঠিক

করলাম চুপচাপ থেকে কয়েকটা দিন নজর রাখি না কেন। লক্ষ করলাম কারুবে কেমন করে কড়াইটাতে ঝাঁকানি দেয় ইয়াশিকির দৃষ্টি শুধু সেই-দিকে। কারুবের এই কাজটা ছিল আমাদের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য। অন্য কোন কারখানা এই কাজটা আমাদের থেকে নকল করতে পারেনি এতদিন। ইয়াশিকির কাজ ছিল পেতলের চাদরগুলো কসটিক সোডা গোলা জলে ডুবিয়ে বার্নিশ আর আঠার দাগগুলো তুলে ফেলা—ক্ষইয়ে দেবার ফেরিক ক্লোরাইড দ্রবণের সঙ্গে কারুবে ওই বার্নিশ আর আঠা এর আগে ব্যবহার করেছে ওই পেতলের চাদরের ওপর। অতএব ইয়াশিকির আগ্রহ থাকতেই পারে কারুবের কাজকর্মে। কিন্তু মনে একবার সন্দেহ ঢুকলে যা হয়, সমস্ত ব্যাপারটার স্বাভাবিকত্বই আরো সন্দেহের জন্ম দেয়।

কারুবের এদিকে মহাফূর্তি—ওর কথা শোনবার একজন লোক পেয়েছে, ওর কেরামতি দেখাতে ফেরিক ক্লোরাইডের কড়াইটা ধরে ওস্তাদি ঢঙে ঝাঁকানি দিচ্ছে। আমাকে নিয়ে ওর এত সন্দেহ, তাহলে স্বাভাবিকভাবেই ইয়াশিকির ওপর আরো বেশি সন্দেহ হবার কথা। কিন্তু কার্যত দেখছি উলটো ব্যাপার। কড়াই ঝাঁকানোর কায়দাটা বিশেষজ্ঞের ভাষায় এমন লেকচার দিয়ে বোঝাচ্ছে যে আমি ভেবে পাই না ও শিখল কোথায় এত সব তত্ত্বকথা। অক্ষর খোদাই করা দিকটা তোমার থাকবে নীচের দিকে তাহলে কাজের কাজ ওই ধাতব প্লেটের ওজন দিয়েই হয়ে যাবে। খোদাই করা নেই যে সব জায়গাগুলো ক্ষয় ধরবে সেখানেই খুব তাড়াতাড়ি—আচ্ছা ইয়াশিকি নিজেই কেন একবার চেষ্টা করে দেখুক না। প্রথম প্রথম এইসব গুজগুজ ফুসফুস শুনতে আমার বেশ ভয় লাগছিল। তারপর ভাবলাম উনিশ বিশ হবে বা কি ছাই। যাকে চায় তাকেই দিকনা জানিয়ে গোপন তথ্যগুলো। ইয়াশিকিকে নিয়ে আমাকে আর হুঁশিয়ার থাকতে হবে না।

এই ঘটনাটা থেকে আমার একটা লাভ হল। সেটা হল একটা জ্ঞান, যে কোন গোপন তথ্য ফাঁস হয়ে যায় আসলে সেটা গোপন করে যার রাখার কথা তারই অহমিকা থেকে। তবে কারুবের অহমিকাই শুধু দায়ী ছিল না

ইয়াশিকির কাছে ওর সব কথা প্রকাশ করে দেওয়ার ব্যাপারে। নির্দ্বিধায় বলা যায় ইয়াশিকির খুব ভাল পটাবার ক্ষমতা আছে। ওর চোখের দৃষ্টি বেশ ধারালো হলেও নরম করে যখন তাকাতো তখন বেশ একটা আবেশের সৃষ্টি করতে পারত। যার দিকে তাকাচ্ছে তার তরফ থেকে সাবধানতার বেড়া আপনা থেকেই ঘুচে যেত। ও কোন কথা বলার কালে এই আবেশ আমাকেও মুগ্ধ করত কিন্তু নানা কাজে আমি তখন এত ছুটোছুটি করছি যে ওর কথায় মন দিতে পারিনি। একেবারে ভোর থেকে আমাকে গরম পেতলের ওপর রং ধরিয়ে শুকিয়ে নিতে হত। অ্যামোনিয়াম ডাইক্রোমেট-এর প্রলেপ লাগানো ধাতুর প্লেট গুলোকে রোদে মেলে দিতে হত। তারপর তাদের ওপর অ্যানিলিন লাগিয়ে ছুটতে হত বার্নার-এর শিখার দিকে। সেখান থেকে পালিশ যন্ত্রের দিকে। সেখান থেকে আবার কাটবার যন্ত্রের দিকে। ইয়াশিকির কথায়, চাউনিতে মুগ্ধ হবার সময় আমার কোথায়!

ও আসার পরে বোধহয় দিন পাঁচেক বাদে এক রাতে আমার ঘুম ভেঙে গেছে। দেখি ইয়াশিকি, ওর তখন রাতের ডিউটি চলছে, ডার্করুম থেকে বেরিয়ে মনিব গিন্নির ঘরে ঢুকল। অত রাত্রে মনিব গিন্নীর ঘরে কী নিয়ে যাচ্ছে ভাবতে ভাবতে দুর্ভাগ্যক্রমে আবার ঘুমিয়ে পড়েছি। কিন্তু সকালে ঘুম থেকে উঠে প্রথমেই মনে পড়েছে ইয়াশিকির কথা। কিন্তু মুস্কিল হল ক্রমে ক্রমে আমার মনে হতে লাগল আমি কি সত্যিই ওকে দেখেছিলাম, না কি স্বপ্ন দেখেছিলাম। এমনি অভিজ্ঞতা এর আগেও আমার হয়েছে বেশি খাটা খাটুনির পরে ঘুমোবার কালে। তাই আমার সন্দেহ হল যে আমি স্বপ্নই দেখেছিলাম। ডার্করুমে কেন ঢুকছে সেটা আমি সহজে আন্দাজ করতে পারি কিন্তু অন্য কামরাটায় ওর কী কাজ সেটা আমার বুদ্ধির অগম্য। আমি তো বিশ্বাসই করতে পারি না ইয়াশিকিতে আর মনিব গিন্নিতে গোপনে গোপনে চালাচ্ছে। অতএব সহজ সমাধান হল আমি ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্নই দেখছিলাম। তাহলেই আপদ চুকে যায়।

দুপুর নাগাত মনিব হাসছিলেন আর স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করছিলেন আগের

দিন রাত্রে স্বাভাবিকের থেকে ভিন্ন ধরনের কিছু ঘটেছিল কিনা। মনিব গিন্নি খুব শান্ত গলায় বললেন 'হতে পারে, আমার ঘুম খুব গাঢ়। কিন্তু আমি জানি টাকা কে নিয়েছে। টাকা চুরি করতে হয়তো করো কিন্তু একটু বুদ্ধিমানের মত চুরি করবে তো?' মনিব তো তাই শুনে আরো আমোদ পেয়ে প্রাণখুলে হেসে উঠলেন।

তাহলে কি ইয়াশিকি নয় মনিবকেই আমি দেখেছিলাম ও ঘরে ঢুকতে। কিন্তু নিজের বৌ-এর ঘরে অমন চোরের মতন ঢুকবে কেন—হলেই বা ওঁর টাকার নিত্য অভাব।

'তাহলে আমি আপনাকেই দেখেছিলাম ডার্করুম থেকে বেরিয়ে আসতে?' আমি মনিবকে শুধালাম।

'ডার্করুম! ডার্করুমের কথা তো আমি কিছু জানি না?

এযে দেখি জটিলতা আরো গভীর হয়। তাহলে কি ডার্করুমে ইয়াশিকি-কেই দেখেছিলাম? যে লোকটা গিন্নির ঘরে ঢুকেছিল সেতো পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে ইয়াশিকি নয় ওর স্বামী। কিন্তু আমি যে মানতে পারছিনা যে ইয়াশিকি ডার্করুম থেকে বেরিয়ে আসছে এটা আমি স্বপ্নেই দেখেছিলাম। যে সন্দেহটা কেটে গিয়েছিল সেটা আবার ঘন হয়ে ঘিরে ফ্যালে মনটাকে। আমি দেখলাম একা একা সন্দেহ পোষণ করতে গিয়ে নিজের ওপরেই সন্দেহ জাগে তার চেয়ে বরং ইয়াশিকিকে সরাসরি জিজ্ঞেস করেই দেখি না। কিন্তু যদি জিজ্ঞেস করি আর সত্যিই যদি ও হয় তাহলে ও ঘাবড়ে যাবে আর ওকে ঘাবড়ে দিয়ে কোন লাভ হবে না।

কিন্তু ব্যাপারটা এতই কৌতূহল জাগাচ্ছে যে কতদূর গড়ায় যদি না দেখি তাহলে সেটা খুবই আক্ষেপের হবে। প্রথমত, বিসমাথ আর জির কনিয়াম সিলিকেটের মধ্যে বিক্রিয়া ঘটানোর ফর্মুলাটা যেটা নিয়ে আমি কাজ করছিলাম আর লাল চুর্ণ সেলেনিয়ামের মিনে ধরাবার ফর্মুলা যেটা মনিবের আবিষ্কার দুটোই রাখা ছিল ডার্করুমে। এগুলো যদি খোয়া যায় তাহলে যে কেবল ব্যবসারই সমূহ ক্ষতি হবে তাই নয় আমার গোপন রাখা রহস্য

ফাঁস হয়ে গেলে বেঁচে থাকার সব আনন্দই আমার ফুরিয়ে যাবে। ইয়াশিকি যদি ফর্মুলা চুরি করতে চায় তাহলে আমিই বা কেন না সেটা গুপ্ত রাখতে চেষ্টা করব? আরো গভীরভাবে ওকে সন্দেহ করতে লাগলাম। ভেবে দেখলাম প্রথমে কারুবে আমাকে সন্দেহ করত আর এখন আমার পালা ইয়াশিকিকে সন্দেহ করা। তাহলে কি এখন আমি ইয়াশিকিকে সেই আত্ম-প্রসাদের আনন্দটা দিচ্ছি যেমন আমি মজা পেতাম কারুবেকে বোকা বানাবার আনন্দ থেকে। কিন্তু আমি স্থির করলাম যে আমাকে বোকা বানাতে পারছে এমনটা ঘটতে দেওয়াই ভালো। তাই এখন আমি ইয়াশিকির দিকেই পুরো মনটা দিলাম।

ইয়াশিকি হয়ত লক্ষ করে থাকবে যে ওর দিকে তাকালে আমার চোখে আগুন জ্বলে ওঠে। তাই ও দৃষ্টি ফিরিয়ে রাখে এমন সব দিকে যাতে কিছুতেই আমার সঙ্গে চোখাচোখি না হয়। আমাকে আরো সজাগ হতে হবে। চোখ হল এক আজব জিনিস। চেতনার একই স্তরে যে দৃষ্টির ঘোরা ফেরা তারা যখন পরস্পরের মিলিত হয় তখন একজোড়া সন্ধানী চোখ যেন অন্য জোড়ার ভেতরে অত্যন্ত গভীরে পৌঁছে যায়।

হয়ত আমি পালিশ করার যন্ত্রটার কাছে দাঁড়িয়ে আছি একথা সে কথা বলছি আমার চোখের দৃষ্টি কিন্তু ওকে শুধাচ্ছে, 'ফর্মুলাটা চুরি করে ফেলেছ না কি?

ওর জ্বলন্ত চোখের দৃষ্টি যেন জানিয়ে দেয়, 'এখনো করিনি, এখনো করিনি।'

'তা, তাড়াতাড়ি সেরে ফ্যালো?'

'বেজায় সময় লাগে, এখন আবার তুমি জেনে ফেলেছ তো আমার মৎলবটা কী।'

'আমার ফর্মুলায় গণ্ডা গণ্ডা ভুল। এখন যদি চুরি করো তো তোমার কোন কাজে আসবে না।'

'আমি সব ঠিক করে শুধরে নেবো।'

তো এইভাবে কাল্পনিক কথোপকথন চলে চোখে চোখে ইয়াশিকির সঙ্গে যতকাল আমাকে কাজ করতে হয়। ক্রমশ ওর প্রতি আমার বন্ধুতার ভাবটা বেড়ে ওঠে ওখানকার অন্য সকলের থেকে। ইয়াশিকির মোহাবেশ যা কিনা প্রথম প্রথম কারুবেকে উত্তেজিত করেছিল আর ওর কাছ থেকে ওর জানা গোপন তথ্য সব প্রকাশ করে দিয়েছিল সেই মোহাবেশ এখন আমার ওপর ক্রিয়াশীল হয়েছে। আজকাল আমি আর ইয়াশিকা এক সঙ্গে খবরের কাগজ পড়ি যে, সব বিষয়ে আমাদের উভয়ের আগ্রহ দেখা যাচ্ছে সেগুলোতে আমাদের মতামত একেবারে মিলে যাচ্ছে। বিশেষ করে প্রযুক্তিগত বিষয় গুলোতে। ও তাড়াতাড়ি পড়লে আমিও তাড়াতাড়ি পড়ে নিই। ওর পড়া মন্থর হলে আমার পড়াও চলে ঢিমা তালে। আমাদের উভয়ের রাজনৈতিক মতামত, সমাজ সংস্কারের পরিকল্পনা একেবারে অভিন্ন। কেবল একটা প্রশ্নে আমাদের মধ্যে মতান্তর ছিল সেটা হল কোন ব্যক্তির উদ্ভাবনকে চুরি করে আত্মসাৎ করার বিষয়ে। ও মনে করত এরকম চুরি দোষের নয় যদি এই চুরির দ্বারা মানব সভ্যতাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়। এরকম ক্ষেত্রে যে লোকটা চুরি করছে সে অনেক উঁচুদরের মানুষ—যে চুরি করছে না তার চেয়ে। ওর গুপ্তচরগিরির সঙ্গে যখন তুলনা করি আমার নিজের উদ্ভাবনকে গোপন রাখার চেষ্টাকে, তখন সিদ্ধান্ত নিতে পারি পৃথিবীটাকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে ও অনেক বেশি কাজ করছে আমার চেয়ে। আমি এই ভাবে চিন্তা করছিলাম অথবা ইয়াশিকি আমাকে এই ধারায় চিন্তা করাচ্ছিল। ক্রমশ ক্রমশ ও আমার মনের খুব ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে পেঁাছে গিয়েছিল। তথাপি আমি চাইছিলাম চূর্ণ সেলিনিয়ামের মিনে করার রহস্যটা ওর কাছে গোপন রাখব। তাই ওর খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু হয়েছিলাম ঠিকই তথাপি ওর লক্ষ্য পথের সব চেয়ে বড় বাধাও ছিলাম আমি।

ওকে আমি বলেছিলাম যে আমি যখন প্রথমে এখানে আসি তখন কারুবে সন্দেহ করত যে আমি একজন গুপ্তচর। আমাকে প্রায় খুন করে ফেলেছিল। ইয়াশিকি তাই শুনে হেসে বলেছিল যে কারুবে ওকে

খুন করেনি তার কারণ হল আমাকে দিয়ে কারুবের একটা শিক্ষা হয়ে গিয়েছিল।

'ও, তাই বুঝি তোমার পক্ষে আমাকে সন্দেহ করা এত সোজা হয়ে গিয়েছিল', কিছুটা উষ্ণতা প্রসূত ওর প্রশ্ন।

'তা আগাগোড়াই তুমি যখন জানতে যে আমি তোমাকে সন্দেহ করি, তার মানে আগে থেকে তুমি তৈরি হয়েই এসেছিলে যে তোমাকে সন্দেহ করা হবে।'

'ঠিকই ধরেছ,' ও বলল।

তার মানে ও এক রকম স্বীকারই করলো যে আমাদের গোপন তথ্যগুলো চুরি করতেই ও এখানে এসেছে। আমি আশ্চর্য হয়ে গেলাম কত খোলাখুলি ভাবে ও কথাটা স্বীকার করলো। সম্ভবত আমার ভেতরটা পর্যন্ত চিনে নিয়েছিল আর তাই ও নিশ্চিত হয়েছিল যে ওর এই অকপটতায় আমি আশ্চর্য হয়ে যাবো। ওর প্রতি আমার সম্ভ্রম বাড়বে। কয়েক সেকেণ্ড ধরে ওর দিকে কটমট করে তাকিয়ে রইলাম।

কিন্তু ইয়াশিকির মুখ চোখের ভাবে ইতিমধ্যেই বদলে গিয়েছিল। যেন খুব উদারতা দেখাচ্ছে এইভাবে ও বললো: 'এরকম একটা কারখানায় এলে স্বভাবতই লোকে ভাববে যে তুমি কোন মৎলব নিয়ে এসেছ। কিন্তু আমার মত লোক কী আর করতে পারবে বলো। না, না, আমি ক্ষমা টমা চাইছি না। বরং আমরা যে যেমন কাজ করে চলেছি তেমনিই চলুক না।' একটু হেসে ও আরো বলল, 'খুব খারাপ লাগে যখন তোমার মত একজন লোক আমাকে সন্দেহ করে ভাবে আমি মন্দ একটা কিছু করতে চলেছি আসলে যখন আমি সেসব কিছুই করতে যাচ্ছি না।'

ও আমার একটা কোমল তন্ত্রীতে স্পর্শ করেছিল। লোকটার ওপর এক ধরনের সহানুভূতি অনুভব করছিলাম। মনে হচ্ছিল এই ধরনের ব্যবহার আমিও পেয়ে এসেছি আজ যেমন ও পাচ্ছে আমার কাছে।

'আহা, তোমার মনের ভেতরে যদি এমনি ভাবনা হয় তার মানে তো কাজ থেকে তুমি কোন আনন্দই পাওনা,' আমি বললাম।

ইয়াশিকি ওর কাঁধ দুটো একটু পিছিয়ে যেন একটু সিটিয়ে গেল, আমার দিকে আড়চোখে একটু চেয়ে হেসে উড়িয়ে দিল কথাটা।

তখন আমি ঠিক করলাম, করুকগে যাক্ যা খুশি ওর মন চায়। ওর মত এলেমদার লোক ডাকর্‌রুমে একবার ঢুকেই সব কিছু দেখে নিয়েছে। এখন এর পরিণতি যাই হোক না কেন সেটা মেনে নিতে হবে—এক যদি না ওকে খতম করে দেওয়া হয়। এমনি একটা জায়গায় এমন একটা লোককে পাওয়ার জন্যে বোধ হয় আমার কৃতজ্ঞ থাকা উচিত।

আমার ভাবনা আরো এক ধাপ এগিয়েছিল। ভাবলাম ঃ মনিবের ভালো-মানুষীর সুযোগ নিয়ে শেষ পর্যন্ত যদি আমাদের গোপন তথ্যগুলো ও চুরি করতে পারে তাহলে সেটাই বোধহয় সবদিক দিয়ে দেখলে ভালো হবে।

একদিন ওকে আমি বললাম, 'এখানে আর বেশিদিন থাকব না। কোন ভাল জায়গায় চাকরী বাকরীর সন্ধান তোমার জানা আছে কি ?'

'বাঃ রে আমিও তো তোমাকে ওই কথাই শুধাব ভাবছিলাম। তা আমরা যদি এই ব্যাপারেও হরিহর আত্মা তাহলে বাপু আমাকে অত লেকচার ঝাড়-ছিলে কেন সেদিন ?'

'বুঝেছি তুমি কী বলতে চাইছ। আমাকে ভুল বুঝো না। আমি লেক-চার দিতেও চাইনি, গোয়েন্দাগিরিও করতে চাইনা। আমি তোমাকে শ্রদ্ধা করি। আমাকে তোমার সাগরেদ করে নাও না।'

'সাগরেদ', ওর মুখে সূক্ষ্ম হাসি, তারপর আবার গম্ভীর। 'যাও, দেখে এস যে কোন ফেরিক ক্লোরাইডের কারখানা। দেখবে চারদিকে একশ গজ জায়গা জুড়ে সব মরে গেছে, ঘাস আর গজায় না, তারপরে কথা বলতে এসো।'

'তারপরে' কথাটার মানে আমি বুঝতে পারিনি। তবে মনে হল আমি যেন ধরতে পাচ্ছি কোন যুক্তিতে ও আমাকে সরল আর ভালো মানুষ ভেবে নিয়েছে। তবে আমাকে বোকা প্রতিপন্ন করতে কত না দূর পর্যন্ত ও যেতে পারে। সেই সীমারেখা যেন আমার দৃষ্টির নাগালের বাইরে। ক্রমশ

আমার এ ব্যাপারে আগ্রহ চলে গেল। । বরং আমার মনে হতে লাগল আমিই কেন না চেষ্টা করি ওকে বোকা প্রতিপন্ন করতে। আমি ওর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েছিলাম, তাই আমার চেষ্টা ফলপ্রসূ হল না, আসলে যেন একটা লোক হাসানো ব্যাপার হল। এই সব উঁচুদরের মানুষেরা আমাদের মত লোকেদের বড় কঠিন অনুশাসনে বেঁধে রাখতে পারে।

একদিন, তখন আমাদের এই বড়ো অর্ডারের কাজটা তুলতে খুব খাটুনি চলছে, কারুবে হঠাৎ ইয়াশিকিকে মাটিতে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিল। ইয়াশিকি মুখ থুবড়ে পড়ল কাটার যন্ত্রটার তলায় পড়ে থাকা টুকরো করা ধাতুর স্তূপের ওপর।

'বল, সত্যি করে, স্বীকার কর।' ও চ্যাঁচাচ্ছিল।

ও নাকি ইয়াশিকিকে চুপি চুপি ডার্করুমে ঢুকতে যাওয়ার মুখে হাতেনাতে ধরে ফেলেছে।

আমি কারখানায় ঢুকে দেখলাম ইয়াশিকির পিঠের ওপর বসে কারুবে ওর মাথাটা বার বার ঠুকে দিচ্ছে। বাঃ তাহলে শেষ পর্যন্ত এটা ঘটল, আমি ভাবছিলাম। কিন্তু ইয়াশিকিকে বাঁচাবার কোন তাগিদই বোধ করছিলাম না। প্রকৃতপক্ষে আমার ভূমিকা যেন জুডাসের—আমার কৌতুহল কেবল দেখি না, যে লোকটাকে আমি শ্রদ্ধা করি সহিংসতার মোকাবিলা সে কেমন ভাবে করে। আমি ইয়াশিকির যন্ত্রণায়-বিকৃত মুখের দিকে বেশ নিরুত্তাপ ভঙ্গীতে তাকিয়ে ছিলাম। ও উঠতে চেষ্টা করছিল, ওর মাথার একটা পাশ মাটিতে গড়িয়ে যাওয়া কি একটা বার্নিশের সঙ্গে মাখামাখি। যতবার কারুবে হাঁটু দিয়ে ওর পিঠে মারছিল ততবার ও মুখ থুবড়ে পড়ে যাচ্ছিল। ওর পাজামা গুটিয়ে অনেকখানি ওপরে উঠে গিয়েছিল। ওর মোটা মোটা নগ্ন পা দুটো মেঝের ওপর এলোমেলো ভাবে আছড়ে পড়ছিল। ওর এই ছটফটানি, এইভাবে বাধাদানের চেষ্টা আমার কাছে মনে হচ্ছিল নিছক বোকামি—কিন্তু বোকামির কারণে তুচ্ছ তাচ্ছিল্যের ভাবের থেকেও বেশি করে ওর প্রতি একটা ঘেন্নার ভাব চাগিয়ে উঠছিল। যেন যাকে শ্রদ্ধা করি, যার মুখ এখন যন্ত্রণায়

কুৎসিত, সেই কুৎসিত মুখের ভেতর থেকে একটা আরো কুৎসিত মনের চেহারাও যেন দেখতে পাচ্ছিলাম। এই মারধোর, সহিংসতা আমাকে ততটা বিচলিত করেনি যতটা করেছিল সেই চিন্তা যে কারুবে একটা মানুষের মুখের ওপর এমন কুৎসিত অভিব্যক্তি কেমন করে ফুটিয়ে তুলতে সক্ষম হল।

কারুবের অবশ্য কুৎসিত বা সুন্দর কোন রকমের অভিব্যক্তি চেনবার চোখ ছিল না। দুহাত দিয়ে ইয়াশিকির ঘাড়টা ধরে মাথাটা ও মেঝের ওপর ঠুকে দিচ্ছিল। আমার সন্দেহ জাগছিল, এই যে মানুষের যন্ত্রণা চোখের সামনে দেখছি উদাসীনভাবে আমার এই আচরণটা বোধহয় স্বাভাবিক নয়। কিন্তু আবার মনে হল ওদের দুজনের মধ্যে কোন একজনকে যদি সাহায্য করতে যাই সেই কাজটা আরো খারাপ হবে। আরো ভাবছিলাম ঃ আচ্ছা ইয়াশিকি এত মার খাচ্ছে, যন্ত্রণায় ওর মুখ এমন বীভৎস হয়ে গেছে তবুও স্বীকার করছে না! তাহলে কি ও ডাকরুম থেকে সত্যিই কিছু চুরি করেনি? তাই ওর বিকৃত মুখের প্রত্যেকটা খাঁজ থেকে ওর মনের গোপন তথ্যগুলো উদ্ধার করতে আমি নিবিষ্ট হয়ে যাই। এক একবার ও আমার দিকে তাকাচ্ছিল। ওকে শক্তি দিতে আমি আমার মুখে ঘেন্না মেশানো হাসির দৃষ্টি ফুটিয়ে তুলছিলাম—যখনই ওর সঙ্গে চোখাচোখি হচ্ছিল। কারুবেকে উল্টে ফেলে দেবার একটা কঠোর চেষ্টা একবার করল। কিন্তু না, বেচারা একেবারে বেকায়দায় পড়েছে। বৃষ্টি ধারার মত নেমে এল আরো একদফা কিল চড় ঘুষি।

ওর এই দশায় আমি হাসছি দেখে ইয়াশিকি চমকে উঠছিল—ওর আসল রূপটা যেন ক্রমে ক্রমে স্পষ্ট হচ্ছিল। ও লড়ে যাচ্ছে ঠিকই কিন্তু ওর প্রত্যেকটা আচরণ থেকেই যেন নিজেকে প্রকাশ করে দিচ্ছে। ওর দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে আমি হাসছিলাম ঠিকই কিন্তু একটা ঘৃণাবোধ যেন আমার মধ্যে থেকে ঠেলে উঠছিল—শেষে আমার মুখে আর হাসি ফুটে ওঠে না। কই ও তো লড়তে পারছে না—কোথায় গেল ওর জোরালো প্রতিবাদ, দৃপ্ত প্রতিরোধ। লোকটা তো দেখছি নেহাতই সাধারণ, আমাদের কারো থেকে একটুও আলাদা নয়।

'আর নাই বা মারলে,' কারুবেকে আমি বলি, 'ও কী বলে এবার শোনা যাক না।' 'উঠে দাঁড়া',কারুবে ওর হাতে নিগৃহীত মানুষটাকে এক লাথি মেরে বললে—বলবার কালে ওর মাথার ওপর একরাশ অ্যালুমিনিয়ামের টুকরো ঢেলে দিল। ঠিক যেমন আমার মুখটা রগড়ে দিয়েছিল এই রকমের অ্যালুমিনিয়ামের টুকরোর স্তূপের মধ্যে।

ইয়াশিকি একধারে সরে গিয়ে দেয়ালের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়েছিল। গড়গড় করে ও বলে গেল ডার্করুমে ও ঢুকেছিল অ্যামোনিয়ার খোঁজে। ধাতুর চাদর থেকে কস্টিক সোডা দিয়ে শিরিষের আঠা তুলতে গিয়ে পরিষ্কার হচ্ছিল না তাই।

'অ্যামোনিয়ার দরকার হয়েছিল তো চেয়ে নিসনি কেন?' কারুবে আবার ধমক দেয়, হাতও চলে সেই সঙ্গে। সবাই জানে নেমপ্লেট-এর ফ্যাকটরিতে ডার্করুম হল সবচেয়ে জরুরী জায়গা।

আমি জানতাম ইয়াশিকির ওজুহাতটা নেহাতই আজগুবি। তথাপি কারুবের ঘুষিগুলো সাংঘাতিক ওজনদার। 'এবারে মারধরটা থামালে পারতে,' আমি বলি।

তাই শুনে কারুবে আমাকে নিয়ে পড়ে, 'তাহলে তোরা দুজনে মিলে ষড় করেছিলি, তাই না?'

'একটু ভেবে দেখলে সে কথার উত্তর তুমি নিজেই দিতে পারবে,' আমি বলতে যাচ্ছিলাম। কিন্তু মনে হল আমাদের কাজকর্ম থেকে যে কেউ মনে করতে পারে যে আমরা ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলাম, কেন, সত্যিই তো আমাদের আচরণ কি ষড়যন্ত্রের খুব কাছাকাছি নয়! আমিই তো ঠান্ডা মাথায় ইয়াশিকিকে ডার্করুমে ঢুকিয়ে থাকতে পারি—মালিকের গোপন পদ্ধতিগুলো চুরি করতে পারিনি বলে নিজের মধ্যে খানিকটা হীনমন্যতা বোধ করেছিলাম না কি? কার্যত দেখা যাচ্ছে গোটা ব্যাপারটা একটা ষড়যন্ত্র।

আমার বিবেক যখন এইভাবে আমাকে কষ্ট দিচ্ছিল তখন আমি নিজের ওপর বেশ একটা আস্থার ভাব ফুটিয়ে তুললাম। 'ষড় থাকুক বা নাই থাকুক

তুমি ওকে খুব মেরেছো,' আমি বললাম।

তাই শুনে কারুবে আমার চোয়ালে এক ঘুষি ঝাড়ল, 'তাহলে তুই-ই ওকে ডার্করুমে যেতে দিয়েছিলি।'

মার খাওয়ার ভয়ের থেকেও আমার উদ্বেগ বেশি। ইয়াশিকিকে দেখাতে চাই—দেখ তুমি মার খেয়েছ আর তোমার অপরাধ নিজের ঘাড়ে নিয়ে আমি কত মার খাচ্ছি। এর ফলে ভেতর ভেতর আমার উল্লাস বাড়ছে।

'দেখ, আমার দিকে,' আমি চিৎকার করে বলতে চাই। মনের মধ্যে একটা অদ্ভুত ভাবনা ঠেলে ঠেলে উঠছিল, এখন নিশ্চয় কারুবে আর আমার মধ্যে ষড় ছিল বলেই বোধ হচ্ছে। ইয়াশিকি নিশ্চয় ভাবছে এই যে আমি মার খাচ্ছি কোন কিছু ভ্রূক্ষেপ না করে, এর মানে হল আমরা আগেভাগেই এটা ঠিক করে রেখেছিলাম। ওর দিকে আমি তাকালাম—ও যেন বেশ প্রাণ পেয়ে গেছে, আমরা দুজন একজোট হয়েছি ধরতে পেরে।

'মারো ও কে!' পেছন থেকে কারুবের পিঠের দিকে ইয়াশিকির হাত চলছিল।

সেজন্য আমার খুব একটা রাগ হল না। কিন্তু মার খাওয়ার যন্ত্রণার দরুণ একটা আনন্দও পাচ্ছিলাম মারগুলো ফিরিয়ে দেবার সময়। কারুবের মুখে বারকয়েক ঘুষি কষিয়ে দিলাম। সামনে পেছনে দুদিক থেকে আক্রান্ত হয়ে কারুবে ইয়াশিকির দিকেই বেশি মনোযোগ দিল। তখন আমি ওকে পিছন দিকে টেনে রাখলাম। সুযোগ পেলেই ইয়াশিকির ঘুষিগুলো জায়গা-মত বসে যাচ্ছিল যার ফলে কারুবে মাটিতে পড়ে গেল। ইয়াশিকি তখন ওর বুকের উপর উঠে বসেছে। কি আশ্চর্য, ইয়াশিকিকে এখন কত চটপটে মনে হচ্ছে। নিঃসন্দেহে, ও এখন ভাবছে যে বিনা কারণে মার খেয়ে এখন আমি ওর দলে হয়ে কারুবেকে মার লাগাচ্ছি।

কিন্তু না, আমার পক্ষে যথেষ্ট হয়েছে—কারুবের ওপর প্রতিহিংসা চরি-তার্থ করার ব্যাপারে। আমি চুপচাপ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে থাকি। কারুবে ইয়াশিকিকে অবলীলায় উলটে ফেলল—আগের চেয়ে আরও প্রবল

বিক্রমে মারতে লাগল। আবার ইয়াশিকির অবস্থা সঙ্গীন। ওকে খানিকটা পিটিয়ে কারুবে হঠাৎ উঠে দাঁড়াল। তারপর এগিয়ে এল আমার দিকে, হয়ত ও ভাবছিল আমি ওকে পেছন দিক থেকে আক্রমণ করবো। কারুবের সঙ্গে একলা লড়তে হলে কী ফল হবে সেটা আগেভাগেই জানা আছে। আমি তাই চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলাম। অপেক্ষা করলাম ইয়াশিকি আমাকে কখন সাহায্য করতে আসে। কিন্তু এ কি হল, ইয়াশিকিতো কারুবেকে মারছে না—এযে দেখছি ও আমাকেই পেটাতে শুরু করলো। একজনের সঙ্গেই পারি না তো দুজনের সঙ্গে লড়ব কি করে। পড়ে পড়ে আমি মার খেলাম।

সত্যিই কি আমি এতটা ভুল করেছিলাম! দুহাত দিয়ে মাথা ঢেকে পেটের মধ্যে পা গুটিয়ে আমি ভাবছিলাম এমন গর্হিত কাজটা আমি কি করলাম যেজন্যে দুজনের কাছে মার খেতে হবে। হ্যাঁ, মানছি আমার আচরণটা হয়ে গিয়েছিল বিভ্রান্তিকর—তা ওরা দুজনেও যা কিছু করলো সেসব কি বিসদৃশ নয়? অন্তত ইয়াশিকির আমাকে মারার কোন কারণ থাকতে পারে না। হ্যাঁ, মানছি কারুবেকে যখন ও মারছিল তখন আমিও হাত লাগাইনি কিন্তু ও কেন বোকার মত ভাবল যে আমিও ওর হয়ে কারুবেকে ধোলাই দেব?

কিন্তু ঘটনাক্রমে দেখা যাচ্ছে একসঙ্গে দুজনের হাতে মার খায়নি কেবল ইয়াশিকি। সবচেয়ে বেশি মার খাওয়া যার প্রাপ্য সেই কেমন চালাকী করে নিজেকে বাঁচিয়েছে। ভাবতে ভাবতে যখন স্থির করলাম ওকেও ভাল মতো ঠ্যাঙাতে হবে ততক্ষণে আমরা তিনজনই অবসন্ন হয়ে পড়েছি। এই যে নিরর্থক মারপিট'এর কারণটা যত না ইয়াশিকি ডার্করুমে ঢুকেছিল বলে তার চেয়ে ঢের জোরালো কারণটা ছিল অন্য। আসলে এত অল্প সময়ের মধ্যে পঞ্চাশ হাজার নেমপ্লেট তৈরি করে দেবার দরুণ নিদারুণ খাটুনিরই এটা পরিণাম। ফেরিক ক্লোরাইডের বিষাক্ত ধোঁয়া মানুষের স্নায়ুগুলোকে ক্ষইয়ে দেয়—বিচার বুদ্ধিকে দেয় বিগড়ে। তার ফলে সহজাত প্রবৃত্তিগুলো যেন মুক্ত হয়ে বেরিয়ে আসতে চায় দেহের প্রতিটি রন্ধ্র থেকে। নেমপ্লেট তৈরীর

কারখানাতে কাজ করতে গিয়ে যদি প্রতিটি তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে রেগে তুলকালাম করতে হয় তাহলে তো রেগে ওঠার ছুতোর আর অন্ত থাকে না।

তবে, ইয়াশিকি আমাকে মেরেছে, সে কথাটা ভুললে চলবে না। আচ্ছা ও কী ভাবছে? ওর আচার আচরণ থেকে যদি সুযোগ করে নিতে পারি তাহলে ওকে আমি নিজের আচরণের জন্যে লজ্জায় ফেলবই।

ঘটনাটা চুকে যাবার পরে—সত্যিই যে ব্যাপারটা নিষ্পত্তি হয়ে গিয়েছিল সে কথা বলা যায় না—ইয়াশিকি আমাকে নিয়ে পড়ল। 'তোমাকে মারাটা আমার ভুল হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু আমার মনে হয়েছিল ব্যাপারটা থামাতে হবে। তা না হলে কারুবে আমাকে আরো কতক্ষণ ধরে পিটত কে জানে। সত্যি, আমি দুঃখিত।'

কথাটা সত্যি। আমাকে মানতেই হলো। আমি, যে কিনা সবচেয়ে কম দোষী, সেই আমি যদি দুজনের হাতে মার না খেতাম তাহলে মারপিট চলতেই থাকত।

আমার মুখে ফুটে ওঠে শুকনো হাসি। তাহলে দাঁড়াচ্ছে এই যে আমি ইয়াশিকির চৌর্যবৃত্তিটাকেই আগলাচ্ছিলাম। তাহলে ওর নিজের কাছে ওকে লজ্জায় ফেলার আনন্দটা ভোগ করাটা স্থগিত রাখতে হচ্ছে। লোকটা ধুরন্ধর মৎলববাজ দেখছি।

বেশ কিছুটা আহতস্বরে ওকে আমি বললাম: 'আমাকে কাজে লাগাতে যখন তোমার মাথায় এত ফন্দী খেলছে। তাহলে ডাকরুম থেকে গোপন তথ্যগুলো সরাবার ব্যাপারেও তোমার বুদ্ধি খুলবে না কেন?'

'তুমিও যদি এভাবে ভাবো, তাহলে কারুবে যে আমাকে মারবে সেটা তো খুব স্বাভাবিক।'

ওর যদি মনে হয়ে থাকে যে মারপিটের ঘটনাটার সূত্রপাত আমার উসকানি থেকেই—সেক্ষেত্রে আমি কোন ভাবেই ওকে বোঝাতে পারব না। হয়ত ওর সন্দেহ হয়েছিল যে কারুবে আর আমি একদলে। দুজনে আমরা সম্বন্ধে কী মনে করে সেটার ধারণা করা ক্রমশ কঠিন থেকে কঠিনতর হয়ে উঠছে।

এত সব অনিশ্চয়তার মধ্যে একটা ব্যাপার স্পষ্ট হয়ে উঠছে ঃ সেটা হল কারুবে আর ইয়াশিকি আলাদা ভাবে নিজেদের ধারণা মতো আমাকে সন্দেহ করে থাকে। কিন্তু এই ব্যাপারটা আমার কাছে যতই স্পষ্ট বলে মনে হোক না কেন কিন্তু কেমন করে জানব সত্যিই ব্যাপারটা কতটা স্পষ্ট ? দেখা যাচ্ছে, অদৃশ্য একটা যন্ত্র যেন আমাদের সবাইকে সর্বদা মাপজোপ করে চলেছে— সেই যন্ত্রটা যেন যা কিছু ঘটছে সে সবই বুঝতে পারছে আর মাপজোক থেকেই যা ফল পাচ্ছে সে অনুসারে আমাদের তাড়িয়ে নিয়ে চলেছে।

যে যার মনের ভেতরে আমরা নিজের নিজের সন্দেহগুলোকে এই ভাবে লালন করে চলেছিলাম ঠিকই তবুও আমরা পরের দিনটার প্রতীক্ষায় উদগ্রীব হয়েছিলাম। ওইদিন আমাদের কাজটা শেষ পর্যন্ত সাঙ্গ হবে আর তার পর আমরা জিরোতে পারবো। ক্লান্তি ভুলে, বৈরিতা ভুলে, মাইনে হাতে আসবে এই খুশিতে দিনটা তো আমরা চুকিয়ে দিলাম। পরের দিন এল এক নতুন ধাক্কা।

পঞ্চাশ হাজার নেমপ্লেট তৈরীর দরুণ পাওয়া টাকাটা নিয়ে বাড়ী আসার পথে আমাদের মনিব সব টাকাটা হারিয়ে ফেলেছেন। দশ দিনের মধ্যে এক-রাতের জন্যেও চোখের পাতা না বুজিয়ে খাটুনি এককথায় নস্যাৎ হয়ে গেল।

সেই যে বোন প্রথম আমাকে এদের সঙ্গে পরিচয় করে দিয়েছিলেন এবারে তিনি গিয়েছিলেন ভায়ের সঙ্গে। মনিব গেলে কোথায় ফেলে আসবেন তাই বোন সঙ্গে ছিলেন। মনিব নাকি বলেছিলেন, আমাদের এতজনের এত দিনের এত পরিশ্রম থেকে পাওয়া টাকাটা একবার উনি হাতে নেবেন—সব টাকাটা। সমঝদার বোন তাই কয়েক মিনিটের জন্যে ভায়ের হাতে পুরো টাকাটা তুলে দিয়েছিলেন। আর সেই কয়েক মিনিটের মধ্যেই নির্ভুল এক মেশিনের মতো গলদটা করে গেছে তার কাজ।

পুলিশে আমরা টাকা হারানোর খবরটা দিলাম বটে তবে আমাদের কারো মনে একবারও ধারণা হয়নি যে সে টাকা কোনদিন আমরা দেখতে পাবো— আমরা কেবল একে অন্যের মুখের দিকে তাকিয়ে বসে রইলাম। মাইনে

কেউ আমাদের দেবে সেকথা আমরা ভাবিও নি—অপরিসীম ক্লান্তি আমাদের আচ্ছন্ন করেছিল। খানিকক্ষণ তো কারখানার ভেতরে আমরা শুয়েই রইলাম পাথরের মতো। তারপর লাথি মেরে দু-একটা তক্তা ভেঙে আর টুকরোগুলো ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে কারুবে আমার ওপর চড়াও হল।

'হাসছিস কেন?'

হাসবার কথা আমার মনে আসেনি, তবুও ও যখন বলছে তাহলে আমি হয়ত হাসছিলাম। মনিব লোকটা কেমন রসিক মানুষ সেই কথাটা হয়ত আমার মনে এসেছিল—মনিবের এই রসিক ভাবটা বোধ হয় অনেক বছর ধরে ফেরিক ক্লোরাইডের ধোঁয়া নাকে যাবারই ফল। নতুন করে আমার উপলব্ধি হল যে মাথা খারাপ হয়ে যাওয়ার থেকে ভয়ের বিষয় খুব কমই আছে। এ কেমন অদ্ভুত একটা ব্যাপার যে একজন মানুষের দোষ ত্রুটিগুলোই তার প্রতি আকর্ষণ বাড়িয়ে দিচ্ছে অন্য লোকের মনে। তারা ভয় অনুভব করতে পারছে না।

কারুবের কথার কোন জবাব দিলাম না। ওকে এসব বোঝাতে যাওয়া বৃথা। তখন কারুবে আর আমার দিকে কটমট করে তাকাচ্ছিল না। 'চল্, মাল টানা যাক,' হাততালি দিয়ে ও বলল।

কথাটা ও এমন একটা মুহূর্তে বলেছে যখন তিন জনের মধ্যে যে কেউ কথা বলতে চাইছিল। আমাদের চিন্তা অবধারিত ভাবেই মদের দিকে ঝুঁকেছিল। ইয়াশিকির পক্ষেও ধারণা করা সম্ভব ছিল না যে মদ খেতে গিয়েই ও প্রাণটা হারাবে।

সে রাতে মাঝরাত্রির পর্যন্ত কারখানায় বসেই আমরা মদ খেলাম।

ঘুম ভেঙ্গে উঠে দেখি ইয়াশিকি জল মনে করে জাগ থেকে পড়ে-থাকা অ্যামোনিয়াম ডাইক্রোমেট খেয়ে মরে পড়ে আছে। এখনো আমি বিশ্বাস করতে পারছি না যে কারুবে ওকে খুন করে থাকতে পারে—যারা ওকে আমাদের কারখানায় পাঠিয়েছিল তাদের ধারণা তাই ছিল।

সেদিন শিরিষের আঠা লাগানোর কাজটা আমিই করেছিলাম—অ্যামো-

নিয়াম ডাইক্রোমেট এই কাজেই লাগে। কিন্তু মাল টানা যাক কথাটা আমি বলিনি,বলেছিল কারুবে। তাই সন্দেহটা বেশি করে ওর ওপর হওয়াই স্বাভাবিক। তথাপি গূঢ় অভিসন্ধি নিয়ে ওকে মদ খাইয়ে তারপরে খুন করবার মৎলব কারুবের পক্ষে কি করা সম্ভব ছিল! তাহলে তো সে রাতে অনেক আগেই আমরা মদ খাওয়ার কথা ভাবতে পারতাম। যাই হোক কারুবেকেই সন্দেহ করা হল, বোধহয় ওর মারমুখো চেহারা দেখে সকলের মনে হয়েছিল যে সহিংসতা ওর পক্ষেই সম্ভব।

আমি অবশ্য জোর দিয়ে বলতে চাইছি না যে কারুবে ইয়াশিকিকে খুন করেনি। শুধু এইটুকুই বলছি যে আমার সীমিত জ্ঞান থেকে এটুকু মাত্র আমি ধারণা করতে পারছি যে ও খুন করেনি। কারণ, আমার মত সেও বুঝেছিল, ইয়াশিকি যখন ডার্করুমে ঢুকেছে, তার মানে ওকে খুন করা ছাড়া গোপন তথ্যগুলো চুরি হয়ে যাওয়া ঠেকানো যাবে না। আমার মনে হয়েছিল ওকে খুন করতে হলে আগে মদ খাইয়ে মাতাল করে তারপর ওর হাতে আমোনিয়াম ডাইক্রোমেটের জাগ ধরিয়ে দিতে হবে। তা এই মৎলবটা কারুবের মাথায়ও এসে থাকতেই পারে। কিন্তু শুধু আমি আর ইয়াশিকিই মাতাল হইনি। কারুবেও বিলক্ষণ মাতাল হয়েছিল। তাহলে কারুবের পক্ষে ইয়াশিকিকে বিষ দেওয়াটা বোধহয় সম্ভব হত না। আর যদি এই সব সম্ভাবনা, যেগুলো গত কয়েকদিন:ধরে কারুবেকে উত্যক্ত করছিল, মাতাল অবস্থাতেও তার মাথায় খেলে থাকে, তাহলে একই যুক্তিতে খুনী আমিই যে নয় কে বলতে পারে। সত্যিই তো আমি কি হলফ করে বলতে পারি যে আমি খুন করিনি? আমিই তো ওকে ভয় করতাম, কারুবে তো নয়। যে কদিন ও এখানে ছিল আমিই সর্বদা সতর্ক থাকতাম। ও ডার্করুমে ঢুকছে কিনা নজর রাখতাম। বিসমাথ আর জিরকনিয়াম সিলিকেট মিশিয়ে যে ফরমুলাটা নিয়ে আমি কাজ করছিলাম সেটা কখন ও চুরি করে নিয়ে যায়— তাই নিয়ে কি আমার আশঙ্কা আর উদ্বেগ ছিল না?

বোধহয় আমিই ওকে খুন করেছি। অ্যামোনিয়াম ডাইক্রোমেট কোথায়

থাকে সেটা আর কারুর চেয়ে আমারই ভাল জানার কথা। মাতাল হবার আগে পর্যন্ত আমার মাথায় চিন্তা ছিল ইয়াশিকিকে নিয়ে। পরের দিন ও কোথায় থাকবে কী করবে—আমি যখন ছুটিতে থাকব। আর ও যদি বেঁচে থাকত তাহলে কারুবের চেয়ে আমারই কি ক্ষতি বেশি হত না? আর মনিবের মত ফেরিক ক্লোরাইডের ধোঁয়া আমার মাথাটাও খারাপ করেনি তো?

এখন আর আমি নিজের বিষয়ে কিছুই বুঝে উঠতে পারছি না। কেবল অনুভব করতে পারছি একটা যন্ত্র, ভীষণ ধারালো একটা বিভীষিকার মত এগিয়ে আসছে আমার দিকে। কেউ আমার বিচার করুক। আমি যে কী করেছি আমি কী করে জানব!

পরিচিতি : ইয়োকোমিৎসু রিইচি

লিরিকধর্মী সাহিত্যিক গোষ্ঠী 'নব্য সংবেদনা' (শিনকানকাকু-হা)-র প্রবক্তা হিসেবে ইয়োকোমিৎসু বিখ্যাত হন। জীবৎকাল 1898-1947। এঁদের প্রতিবাদ বাস্তবধর্মী দুটি গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে যারা বিশের দশকে জনপ্রিয় হয়েছিল। নব্য সংবেদনার দল চমকপ্রদ বাকপ্রতিমা দিয়ে ইন্দ্রিয়লব্ধ অনুভূতির হতচকিত করে দেওয়া ভাবান্তর আয়ত্ত করেছিল। মনে পড়ে গারট্রুড স্টাইল-এর অসচেষ্ট রচনার কথা। এই দলটা একদিকে যেমন জাপানী হাইকু থেকে প্রেরণা নিয়েছে তেমনি সমকালীন ইউরোপের চালু ভাবাদর্শগুলি যেমন ডাডাইজম, ভবিষ্যবাদ, স্ফুটবাদ ইত্যাদির খিচুড়ি থেকেও।

স্বীকারোক্তি প্রধান আত্মকথা কিংবা জনগণের দুঃখ-দুর্দশার বিষয়ে বিশেষ করে লেখনী আস্ফালন দুই-ই এদের অসহ্য মনে হয়েছিল।

ইয়োকোমিৎসু তাঁর আত্মকেন্দ্রিকতাকে পরবর্তীকালে সংযত করেছিলেন। জয়েস ও প্রুস্ত থেকে প্রেরণা নিয়ে মনোজগতের গভীরে অনুসন্ধানের শুরু

হয়। এর পর থেকেই 'মেশিন' হল এরই একটি নমুনা। সর্বতোব্যাপ্ত এই একটি ভাবনাই আমৃত্যু তাঁকে চালিয়ে নিয়ে গেছে। সংবেদনশীল দরদী একটা চেতনা কেমন করে একটা দুষ্কর, অসংগতিভরা পৃথিবীর বুকে পড়ে পড়ে মার খাচ্ছে—নিজেকে যে জানতে চাইছে কিন্তু পারছে না। 'মেশিন' গল্পটাকে এই বিষয়টার ওপর একটা বিবৃতি বলে ধরে নেওয়া চলে।

মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত অসমাপ্ত একটি উপন্যাসে ইয়োকোমিৎসু দেখাতে চাইছিলেন আধুনিক জাপানী বুদ্ধি-বৃত্তি পূব না পশ্চিম এই দোটানায় কেমন পর্যুদস্ত, পথহারা—সেই সংকটকে।

মানুষের জীবন ঃ শ্রীমতী হিরাবায়াশি তাইকো

আচ্ছা, আমার মনের পরিবর্তন হয়েছে এমন কথা বোধহয় কেউই জোর করে বলতে পারে না। আমার মতন একজন লোক এই কথাটা বললে হাসির কথা বলে লোকে ধরতে পারে, নয় কি ? তবে সত্যি বলতে এক ধরনের মনের পরিবর্তন আমার ওপর দিয়েও ঘটে গেছে।

আমরা কি একটা অন্য বিষয় নিয়ে কথাবার্তা বলছিলাম, তখন হঠাৎ প্রাক্তন গুন্ডা সেই এই কথাটা আমাকে বলল।

তাই নাকি ?

আমি অবাক হয়ে গেছি দেখে সেই কিছুটা ইতস্তত করে গল্পটা শুরু করল। বোধহয় অনেক কাল ধরে কাহিনীটা নিজের মনের মধ্যেই চেপে রেখেছিল। বলবার কালে ওর ভঙ্গির মধ্যে একটা স্বাভাবিকতা টের পাওয়া যাচ্ছিল।

তাহলে গোটা ব্যাপারটা আমি নিজের মতো করে বলি। কেননা আমি লোকটা কী ধরনের সেটা বুঝতে না পারলে আমার গল্পটার কোন অর্থই খুঁজে পাবেন না। তখন প্রশান্ত মহাসাগরের যুদ্ধে জাপানের অবস্থা খারাপের দিকে যেতে শুরু করেছে। যে কোন লোকের জীবন যাপনের ধারা হঠাৎ করে পাল্টে যাচ্ছিল। যাকে ইচ্ছে বাধ্যতামূলকভাবে খাটানো হচ্ছিল। আমি তখন বছর খানেক যাবৎ সুগমো-তে জেল খাটছি। খুনের দায়ে ধরা পড়ে শাস্তি ভোগ করছি।

আগের বছর বসন্তকালে শিডা নামের এক মস্তান আমার হাতের ছুরিতে সাবাড় হয়েছিল। তোগোশি-গিনজা-তে ওর একটা হোটেল ছিল। আমার নিজের বিশ্বাস খুন করার দুটো কারণ ছিল। তবে আজ পর্যন্ত ভেবে ভেবে আমি স্থির করতে পারিনি কারণ দুটোর মধ্যে কোনটে আমাকে একেবারে খুন করে ফেলার মত শক্তি দিয়েছিল।

পুলিশ আর সরকারী কৌঁসুলির অফিস ধরে নিয়েছিল যে আমি শিডাকে খতম করেছিলাম, এবারা জেলা থেকে ওদের প্রভাব হঠিয়ে কাওয়ানাকা দলের ক্ষমতা বাড়াবার জন্যে।

আপনি হয়ত জানেন যে আমাদের দলের সর্দার কাওয়ানাকা তখন আশি বছরের বৃদ্ধ। এই ব্যাপারটা মনে রেখে আমার নিজে কাওয়ানাকা দলের মূল খুঁটি বলে ধরে নেওয়াটাই স্বাভাবিক। তাই শিডাকে খুন করা মানে আমার নিজেরই শক্তির ক্ষেত্র বাড়ানো। ধারণাটা খুব একটা ভুলও ছিল না।

আসলে আরেকটা কারণও ছিল। শিডার হোটেলে একটা মেয়ে কাজ করত। আমি তার প্রেমে পড়েছিলাম। মেয়েটার নাম মাচিকো। সুন্দরী, ওর মুখের দিকে তাকালে চোখকে ফেরানো যায় না, স্বভাবেও খুব শান্ত। মনিবের তরফ থেকে কাজের খাতিরে যখন শিডার সঙ্গে দেখা করতে যেতাম তখন এই মেয়েটা আমাকে যত্ন আত্যি করত, গেলাসে মদ ঢেলে দিত।

নিজের খেয়াল হবার আগেই মেয়েটার প্রতি দারুণ আকৃষ্ট হয়ে পড়েছি। ভালবাসার কথা তাকে শোনাতে শুরু করেছি। তবে তাকে স্পর্শ করিনি, বিয়ের প্রস্তাবও করিনি। আসলে হয়ত আমার স্বভাবে কামনার প্রচন্ডতা ছিল না—প্রেমে পড়ে অন্ধ হওয়া আমার ধাতে ছিল না।

তারপর একদিন দৈবাৎ জানতে পারলাম যে মাচিকো হল শিডার মেয়ে মানুষ। মেয়েমানুষের প্রতারণায় এইভাবে নাকাল হয়ে শিডার ওপর প্রচন্ড ক্রোধ হতে লাগল—আসলে কিন্তু কোন যুক্তিতেই ওর ওপর রাগ হবার কথা নয়।

এর কিছুদিনের মধ্যেই এক অন্ধকার রাত্রিতে রান্নাঘরের বাইরে একটা আবর্জনার পিপের আড়ালে লুকিয়ে থেকে শিডাকে আমি ডাক দিই। ও বাইরে এলে ছুরির একটি আঘাতে ওকে খতম করি।

আমাদের প্রথামতো আমি ধরা দিলাম। শিডার তথাকথিত বিশ্বাসহানি ফেনিয়ে ফাঁপিয়ে এক অমার্জনীয় কৃতঘ্নতারূপে প্রতিপন্ন করতে চেষ্টা করলাম। দুই দলে রেশারেশির লড়াইয়ে মানুষ খুন হলেও পাঁচ ছ' বছরের

জেলের ওপর দিয়েই ফাঁড়া কেটে যায় সাধারণত।

কিন্তু দিনকাল তখন খারাপ। কোন না কোন অজুহাত দেখিয়ে এতকাল যুদ্ধে যাওয়া থেকে আমি ফাঁকি দিয়ে এসেছি। সে ব্যাপারটা জানাজানি হয়ে গেল। এর আগে একবার জেল খেটে আসার তথ্যটাও আমার সপক্ষে গেল না।

প্রথম বিচারে তো বেশ ভাল মত সাজা ধার্য হল এগার বছর। কাজে কাজেই আপীল করতে হয়। কিন্তু আমার উকীলের উদাসীনতার কারণে ওপরের আদালতের রায় থেকে ফায়দা খুব কমই হল—এগার থেকে নেমে দশ বছর।

সাধারণত আরো বড় আদালতে এর পরও একবার আপীল করা হয়ে থাকে কিন্তু একে আমি লোকটা বদমেজাজী তার ওপর গোটা ব্যাপারটা যেন অসহনীয় ক্লান্তিকর। আমার জন্যে যে উকিল লাগিয়েছিল কাওয়ানাকা সে লোকটা নিশ্চয় অপদার্থ। তখন আমার কাঁচা বয়স তাই তার ওপর রাগ করে স্থির করলাম, ঠিক হ্যায় জেলই খাটব।

রায় বেরোনর পরের দিন। সকালের জলখাবার চুকে গেছে। আমার কুঠুরীর বাইরে কী ঘটছিল সেদিকেই আবছাভাবে যেন মনটা ব্যাপৃত ছিল। জেলের মধ্যে সকাল হয় পাহারাদারের হাঁক দিয়ে। 'হাসপাতাল', 'জলখাবার', 'হাসপাতাল', 'জলখাবার'। বাইরে কতজনের গলার স্বর শোনা যায়। জেলে মাস দুই থাকলে পরেই 'হাসপাতাল' আর 'জলখাবার' শব্দ দুটো আলাদা করে চেনা যায়। প্রথম প্রথম দুটো শব্দই মিলে মিশে দুর্বোধ্য কোলাহল বলে বোধ হয়ে থাকে। আর ঠিক ততদিনই লাগে বুঝতে, শাদা পোশাকের যে লোকটা ঠেলাগাড়ি ঠেলতে ঠেলতে যাওয়া একজন পুরনো কয়েদীর সঙ্গে সঙ্গে হেঁকে যায় 'মিঠাই!' 'ম্যাগাজিন!' সেও একজন পাহারাদার।

লোকটার বোধহয় একটা বখরা বরাদ্দ আছে কেন না গছিয়েদেবার ব্যাপারে সে বেশ সিদ্ধহস্ত। বন্দিশিবির সমিতি তখনকার দিনে একটা পত্রিকা বের

করত, নাম 'মানুষ'। ওরা হয়ত ভেবেছিল যে এইভাবে পাহারাদারদের সামান্য বেতনের ওপর কিছু উপরি রোজগার হয় তো হোক না।

মাঝে মাঝে শোনা যেত, 'দাড়ি ঘসে নাও!' কল থেকে বরফের মত ঠান্ডা জল এক আঁজলা নিয়ে খুব জোরে জোরে দাড়ি ঘসতে হত। একটু পরেই আসবে তোমার দাড়ি চাঁছার পালা। ভোঁতা একটা যন্ত্র তার নাম নাকি ক্ষুর। সেটা দিয়ে তিনটি কি চারটি পোঁছ, মুখের দুপাশে দুবার নাকের নীচে একবার, একবার থুতনীর নীচে। বলাই বাহুল্য গোটা ব্যাপারটাই ছিল এক যন্ত্রণা।

ওইদিন সকালে আমার কান দুটো খাড়া করে রেখেছিলাম একটা কথা শুনব বলে। স্বাভাবিক থেকে একটু বেশি আগ্রহ নিয়ে। হ্যাঁ, ঠিক যেমন ভেবেছিলাম। পাহারাদারের জুতোর শব্দ আমার কুঠুরীর সামনে এসে থেমে যায়।

'কামরা বদল। 173 নম্বর তৈরি?'

'আজ্ঞে হুজুর, তৈরি হুজুর।'

যুবাবয়সী উদ্যম নিয়ে কথাগুলো বেরিয়ে আসে। কাপড় দিয়ে বাঁধা পুঁটুলিটির দিকে আমার দৃষ্টি। প্রথা হল এই যে দ্বিতীয় বারের জন্যে যারা সাজা পায় তাদের নির্জন কুঠরী থেকে সরিয়ে সাধারণ কারাগারে রাখা হয়, অবশ্য যদি আদর্শগত কোন বাধা না থাকে। আমার মতন একজন তরতাজা জোয়ান ছোকরা, মানুষের সঙ্গে মেলামেশায় যার জুড়ি নেই তার কাছে এই বন্ধ কামরার নির্জনতা থেকে মুক্তি পাওয়ার কত বড় পরিবর্তন সেটা কল্পনাও করতে পারবেন না।

ফুল-লতা-পাতার ছাপ দেওয়া একটা চাদর দিয়ে আমার জিনিসপত্তর সব বাঁধা ছাদা করে রেখেছিলাম। জিনিসগুলো আমি এখানে আসার পরে কিনে ছিলাম। একটা আয়না, সাবানের একটা বার, টুথপেস্ট, টুথব্রাশ, কিছু গেঞ্জি জাঙিয়া, দুই খণ্ডে হিদেওশির জীবনচরিত, মাচিকোর তিনখানা চিঠি। ভারী দরজার পাল্লাটা খুলে যেতেই পুঁটুলিটা তুলে নিয়ে আমি

বাইরে বেরিয়ে এসেছি। এক বছর ধরে যেখানে বাস করে গেলাম সেই কুঠুরিটা ছেড়ে যাবার কালে আমার মনে ভিড় করে আসে সেই সব বেদনা, অনুশোচনা আর বিরক্তির দীর্ঘশ্বাস যেগুলো এই কামরার বাতাসে আমি মুক্ত করেছি গত এক বছর ধরে। কী অসাধারণ বৃথাগর্বের দ্বারা আমরা চালিত হই। আমার নিজের কেসটার কথা ভেবে মনে মনে আমি হাসছিলাম। অথচ কত রাত গেছে যখন দুঃস্বপ্ন দেখতে দেখতে চেঁচিয়ে উঠেছি আর পাহারাদার আমাকে জাগিয়ে দিয়েছে।

চটিটা পায়ে গলিয়ে কুঠুরী থেকে বেরিয়ে তিন তলার ছ'নম্বর ব্লক থেকে এগিয়ে যাই পাঁচ নম্বর ব্লকের সাধারণ কারাগারে। পাঁচ নম্বর ব্লক ছ'নম্বরেরই একটা ফ্যাকড়া। সাধারণ কারাগারটা তিনতলাতেই। পাহারাদার সেলটার দরজাটা খুলে দেয়।

'নতুন লোক।'

এই কথাগুলির সঙ্গে হলটাতে আমি ঢুকে পড়ি। তাহলে আজ থেকে এই হলটার বাসিন্দাদের সঙ্গে আমাকে থাকতে হবে। ঘরটার মাপ হবে পনের ফুট বাই বারো ফুট। দরজা থেকে ওধারের দেওয়াল বরাবর দু'ফুট চওড়া তক্তার পাটাতন হেঁটে চলার জন্যে। পাটাতনের দুধারে চারটে করে মাদুর —আটজন কয়েদীর জন্যে আটটা।

ওপ্রান্তে দেওয়ালের গায়ে একটা করে বাক্স। যার যার নিজের জিনিস-পত্তরের জন্যে। তার পাশে কাঠ দিয়ে ঘেরা শৌচাগার। শৌচাগারের মাথার ওপর একটা জানালা। জানালাটা দিয়ে বাইরের উঠোনের ফুলগাছের ঝোপের মাথাগুলো দেখা যায়। পাটাতনের দুপাশে প্রত্যেকটা মাদুরের ওপর একজন করে মানুষ বসে আছে, নিজের নিজের পছন্দ মত ভঙ্গিতে। আমার পক্ষে এমনি একটা জায়গায় প্রবেশ এই প্রথম নয় তাই আমি জানতাম যে বছর পঞ্চাশেকের যে লোকটা দরজার কাছেই বসে রয়েছে ওই হল সেলটার মনিব বা সরদার। ওকে সম্মান জানিয়ে অভিবাদন করতে আমি তাই একটুও বিলম্ব করি না।

লোকটা প্রায় শোনা যায় না এমনি গলায় ঘোঁত করে একটা আওয়াজ করে ওর ফ্যাকাশে মুখটা ফিরিয়ে নিল। ওর চালবাজি দেখে আমি বেশ চটে গেলাম। এখন বুঝতে পারি যে তখন আমি কত বোকা ছিলাম। কিন্তু সে সময় ভাবতে আমার হাড় জ্বলে গিয়েছিল যে কে না কে এক খুচরো অপরাধী আমাকে পাত্তাই দিতে চায় না।

আমার জ্বলন্ত ক্রুদ্ধ দৃষ্টি দিয়ে বুড়ো লোকটাকে আমি যা বুঝিয়ে দিতে চেয়েছিলাম সেটা হল এই রকমের ঃ 'তোমার সামনে দাঁড়িয়ে থাকা এই বান্দাটির সম্বন্ধে ভুল ধারণা কিছু না রাখাই মঙ্গলের হবে।' মনে মনে আমি বলছিলাম। 'খুন করে তিনি এখানে প্রবেশ করেছেন। যেসব ছিঁচকে চোর নিয়ে এখানে তোমার কাজ কারবার তাদের থেকে তিনি একটু স্বতন্ত্র। তাই তাকে নিয়ে বোকামি কিছু করে বোসো না যেন।'

বুড়ো কিন্তু বিশ বাইশ বছরের উজ্জ্বল-চোখ ছোকরাকে মোটেই আমল দিল না। ওর শুকনো চোখের চঞ্চল দৃষ্টি শূন্যপানে ইতস্তত ঘোরাফেরা করছিল। সে চোখের দিকে তাকিয়ে আমার ভেতরটা শিউরে উঠল। সেই উপবাসী দৃষ্টি যেন কোন একটা জায়গার ওপর স্থির হবার জন্যে ক্ষুধায় আকুলি বিকুলি করছিল। আমার এলোমেলো চিন্তা কিন্তু এই ধারণাটা নিয়ে বেশিক্ষণ মগ্ন থাকে নি। মনের মধ্যে একবার এই চিন্তাটা এসেছিল, 'কত অদ্ভুত ধরনের লোক না জানি এই পৃথিবীতে আছে।'

অদ্ভুত ধরনের লোকদের কথা বলতে গেলে ওই গারদটাতে আরো একজন ছিল। বছর পঁয়ত্রিশ বছর বয়স, জন্ম-কর্ম উঁচু বংশেই বলে মনে হত, বুদ্ধিজীবী গোছের চেহারা। যখন আমি এই সেলে ঢুকি দিয়ে তখন থেকে—তা অনেকক্ষণ হল—দুপুরের খাবার দেবার সময় প্রায় হয়েছিল। বাইরে খাবারের ঠেলা গাড়িটা দূরে রেলের ওপর দিয়ে গড়িয়ে নিয়ে যা. র শব্দ শোনা যাচ্ছিল। তা সেই তখন থেকে এখন পর্যন্ত এই লোকটি ওর বাসন রাখার বাক্সের ঢাকনাটা একটা নোংরা ন্যাকড়া দিয়ে পালিশ করেই চলেছিল। কাপড়টা থেকে এক অদ্ভুত ধরনের চিক্ চিক্ করে শব্দ উঠছিল ঢাকনাটার



সঙ্গে ঘসার কালে।

যুদ্ধ শুরু হবার আগে পর্যন্ত বাসনের বাক্সগুলো বাদামী রঙে পেইন্ট করা থাকত। এখন, যুদ্ধের এই সঙ্গীন অবস্থায়, বাক্সগুলো মামুলি, রং-বিহীন, সাদামাটা কাঠের বাক্স। একবারও না থেমে, কোন দিকে না তাকিয়ে বুদ্ধিজীবী বাক্সের ঢাকনাটা পালিশ করেই চলেছিল। পুরোন হয়ে যাওয়া, বহুবার জলে ভেজা বাক্সটার রং এখন ধূসর। ঢাকনাটাতে একটা চকচকে ভাব এসে গেছে অনেকক্ষণ আগেই, কিন্তু তবুও সেই একই দ্রুত গতিতে লোকটা ওটাকে ঘসেই যাচ্ছিল। শিগগিরই সেলগুলোর বাইরে আরো জোরে জোরে শব্দ শোনা যেতে থাকে। চাকর কয়েদী খাবারগুলো সেলে সেলে রেখে যাচ্ছিল।

লঘু মনে কয়েদীরা যে যার বাক্স থেকে থালা আর বাটি বের করে রাখছিল হেঁটে যাবার কাঠের পাটাতনের ওপর।

আগেরবার যখন জেলে ছিলাম তখন থালা বাটি গুলো ছিল অ্যালুমিনিয়ামের। কিন্তু ধাতুর বাসনপত্র সব জমা পড়ে গেছে সৈন্যদের ব্যবহারের জন্যে। তাই এবার দেখছি আমাদের চিনেমাটির বাসনে খেতে হচ্ছে। থালা বাটির কোনটা ছোট কোনটা বড়। জেলেরই দোকান থেকে কয়েদীরা কেউ কেউ নিজের পয়সায় নিজের জিনিসপত্তর হিসেবে কিনে রেখে গেছে। বাসন গুলো তাই খুবই পুরোন, আগেকার কয়েদীরা অনেককাল ব্যবহার করে তার পর রেখে গেছে। তাই নানান ধরনের বাসন, কোনটা চটা ওঠা, কোনটা ফাটা, কেউ বড় কেউ বা ছোট। সরকারের কী দৈন্য দশা চলছে সেটা এখানেও যেন টের পাওয়া যাচ্ছে।

দৈ-এর স্যুপ যখন হাতায় করে পরিবেশন করা হচ্ছিল, তখন যাদের বাটিগুলো ছোট তাদের অসুবিধে। যাদের ভবিষ্যৎ দৃষ্টি ভাল তারা কোন কয়েদী ছাড়া পাবার কিছু আগে থেকে তাকে পুরো খাবারটাই ঘুষ দেয় যাতে তার ব্যবহার করা বড় বাটিটা ওর জন্যে রেখে যায়। যারা আবার পুরো খাবার প্রাণ ধরে দিতে পারে না তাদের কাজে কাজেই ছোট বাটি নিয়েই কাজ

চালাতে হয়—প্রতিবারই তারা কম খাবার পায়।

সেলের দরজাটা যখন বাইরে থেকে খোলা হয়, তখন সেলের সরদার একবার ঘাড় ফিরিয়ে হুঁক দেয়ঃ

'ঢাকনা।'

'এই যে।' কেউ একজন বাড়িয়ে দেয় তার বাক্সের ঢাকনাটা।

'নোংরা। ভারি নোংরা এটা।'

ভিন্ন গলায় এই বিরূপ মন্তব্যটা শুনে আমি ফিরে তাকালাম। দেখলাম বুদ্ধিজীবী তার ঝকঝকে ঢাকনাটা বাড়িয়ে দিয়েছে। সেলের মনিব বিনাবাক্য-ব্যয়ে ওর ঢাকনাটা নিল। ঢাকনাটাকে ট্রে-র মত করে ধরে প্রত্যেক কয়েদীর বাটিগুলো তার ওপর সাজিয়ে সামনে বাড়িয়ে দিল। চাকর-কয়েদী একটা বালতি থেকে কাঠের একটা হাতা ডুবিয়ে ভাত তুলতে থাকে। হাত দিয়ে সমান করে নিয়ে ভাতটা থালায় উপুড় করে দিচ্ছে। ভাতের সঙ্গে মেশানো আছে কিছু যব আর সয়াবীনের দানা।

লক্ষ করলাম চাকর কয়েদীর সঙ্গে যে পাহারাদার এসেছিল সে যেন একটু আড়ালে সরে গেল আর অন্যদিকে তাকিয়ে রইল। সেই ফাঁকে তিন থালা বেশি খাবার দেওয়া হল এই কামরাটাতে যে কয়জন কয়েদী আছে তার অতিরিক্ত।

'আচ্ছা, তাহলে কয়েদীদের সর্দারের দেখছি একটু ভেতর মহলে জানাশোনা আছে।' মনে মনে এমনিভাবে চিন্তা করে নিয়ে লোকটার দিকে আর একবার ভাল করে তাকালাম। ওর পাশে বুদ্ধিজীবী তখন ওর বাক্সের ঢাকনার ওপর ছিটিয়ে ছড়িয়ে কয়েক দানা ভাত বেশ খুশি মনে এক কোণে জড় করছিল। খুঁটে খুঁটে একটি একটি দানা ও মুখের মধ্যে পাচার করছিল।

এখন আমার ব্যাপারটা বোধগম্য হল। এই কয়েকজন ভাতের দানা বাগাবার জন্যে এত খেটে খুটে বাক্সের ঢাকনাটা চকচকে করে রাখার উদ্যোগ। ব্যাপারটাতে হাস্যকর কিছুই নেই যেমন, তেমনি কোন সাংঘাতিক কিছুও নেই। এখানে এটা একটা খুবই সাধারণ ব্যাপার—ওর চাল চলনের আভি-

জাত্যের থেকেও এই ব্যাপারটাতেই আমাকে একটু বেশি প্রভাবিত করেছিল।

আমার ভাবনাচিন্তাগুলো এইভাবে মনের মধ্যে ঘুরছিল ফিরছিল। এমন সময় চাকর কয়েদী এই কামরার শেষ খাবারটা বেঁটে দিচ্ছিল। মানে আমার খাবারটা।

'একশ আটাত্তর নম্বর—তুমি নাকি?'

নোট বুকে এক পলক দেখে নিয়ে পাহারাদার গারদটার ভেতরের সন্ধানী দৃষ্টিতে তাকিয়ে নিয়ে আমার দিকে থুতনী বাড়িয়ে প্রশ্ন করে। 'আজ্ঞে হ্যাঁ স্যার—হুজুরকে মেহনত করতে হচ্ছে বলে দুঃখিত স্যার।' আমার বুড়ো আঙুলের ছাপ নিল পাহারাদার, বোধহয় রসিদ হিসেবে। তারপর গারদের ভারী দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে চাকর কয়েদীর পিছু পিছু চলে গেল পাশের গারদে।

পাহারাদারের কাছ থেকে আমার খাবারটা গারদের মনিব কয়েদীই নিয়েছিল। ধপধপে সাদা ভাতগুলো দেখতে বোধহয় ওর ভালই লাগছিল। ওর শুকনো চোখের দৃষ্টি ইতস্তত ঘুরছিল, ফিরছিল।

'বাঃ, খাসা। তাহলে এই খাবারটা আমার জন্যই থাকুক।' কথাগুলো বলেছে কি না বলেছে, আর তক্ষুণি খাবারটা নিজের বাসন-কোসনের মধ্যে রাখতে উঠে গেছে।

'ওহে! হচ্ছেটা কি? জানো আমি কে?'

গালিগালাজ দিয়েই শুরু করেছিলাম। তারপর মনে পড়ল লোকটার এখানে কর্তৃমহলে জানাচেনা আছে, সুরটা তাই সঙ্গে সঙ্গে বদলে দিলাম।

'অবশ্য যদি ছমাস এক বছরের মধ্যে ছাড়া পেয়ে যেতাম তখন তোমার মত একজন প্রবীণ লোককে ভাল মন্দ একটু আধটু খেতে দিতে পারতাম। কিন্তু এই গর্তটাতে যখন দশ দশটি বছর কাটাতে হবে…।'

কথাগুলো যেন নিজেকে উদ্দেশ্য করেই বলা। বলার ভঙ্গিটা এমন যেন কিছুটা করুণা দেখানো হচ্ছে কিন্তু আসল মৎলবটা হল এই লোকগুলোকে বুঝিয়ে দেওয়া যে আমার পেছনে বেশ ভাল মত অপরাধের নজির রেখে

এসেছি পুলিশের খাতায়।

খুব সম্ভব আমার নম্বরটা জেনে—মানে 178 সংখ্যাটা ছোট দেখে এই জায়গাটার সঙ্গে যাদের পরিচয় রয়েছে তারা বুঝে নিয়েছিল যে খুন করেই আমার জেল হয়েছে। কিন্তু কই কোথাও, কেউ তো আমাকে দেখে সমীহ করছে বলে মনে হচ্ছে না।

নিজেকে জাহির করবার একটা তাগিদ ছিল ভেতর থেকে, তাই আগে থেকেই গারদের সরদারকে অপদস্থ করতে হবে বলে মনে মনে ভাবছিলাম। কী কী বলছি, পরের পর কোন দিকে এগোচ্ছি সে বিষয়ে আমার পুরো খেয়াল ছিল—এমনকি কীভাবে চোখ পাকিয়ে তাকাচ্ছি পর্যন্ত।

চেঁচামেচি অনেক করলাম কিন্তু মনিব কয়েদীর ওপর কোন ফল হয়েছে বলে মনে হল না। যেন শুনতেই পায়নি এমনি ভঙ্গিতে আমার খাবারটা গুছিয়ে ও রেখে দিল নিজের জিনিসপত্তরের সঙ্গে।

'জাহান্নামে যাও। শুনতে পাওনি, না মগজে ঢোকেনি, কী বলছি তখন থেকে?' রাগে উন্মত্ত হয়ে আমি পেছন থেকে ওকে ঘুষি মেরে ফেলে দিলাম। ওর নোংরা কোট দিয়ে ঢাকা শীর্ণ পীঠখানাকে মনে হল যেন গাছের একটা গুঁড়ি।

গোলমালের মধ্যে আমার খাবারটা খেতে অনেক দেরী হয়ে গেল। খাওয়া যখন চুকল তখন সরদার কয়েদীকে বাইরে নিয়ে গিয়েছিল ব্যায়াম করাবার জন্যে।

'আজব লোক যা হোক! কী জন্যে ওর জেল হয়েছে জানো নাকি?' বছর চল্লিশ বয়সের একজন সঙ্গী কয়েদীকে শুধালাম।

'ওর ফাঁসীর হুকুম হয়েছে। একসঙ্গে দুজন বলে উঠল; ওদের মুখ দুটো আমার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে। সে মুখে যেন কিছুটা গর্বের আলো—আমাকে কিছু শোনাচ্ছে যা শুনে আমি চমকে যাবো।

'তাই বলো—ফাঁসীর হুকুম হয়েছে।' খবরটা শোনার প্রতিক্রিয়া হিসেবে মাথা একটু নোয়ালাম। তবে আমার মনের ভেতরে চিন্তা শুরু হয়েছিল;

আমার মুখও বোধহয় একটু শুকিয়ে উঠেছিল।

'কী করেছিল ?'

'লম্বা ফিরিস্তি। ডাকাতি, ধর্ষণ, খুন, সর্বসমক্ষে নোংরামি।' চল্লিশ ঘেঁষা কয়েদীটি প্রত্যেকটা শব্দ বেশ ভেবেচিন্তে উল্লেখ করছিল। ওর ত্রুটিহীন, নিখুঁত করে বলবার ভঙ্গি সূচিত করছিল অল্প সাজা পাওয়া মানুষটির অন্তরের গভীর সম্ভ্রমকেই—প্রবীণ কয়েদীটির প্রতি।

'রায় চূড়ান্ত হয়ে গেছে নাকি ?'

'হ্যাঁ ওর আপীলটা নাকচ হয়ে গেছে বেশ কিছুদিন হল—এখন যে কোন দিনের অপেক্ষা। জানো তো, চূড়ান্ত হয়ে যাবার পরে একশ দিনের মধ্যেই সেটা কার্যকর করতে হবে।'

নিজের ভেতরটাতে কেমন যেন শূন্যতা বোধ করছিলাম, তাই চুপ করে রইলাম। আমার তরুণ মনের ভেতরের আলোড়নটা ধরতে পেরে চল্লিশ ঘেঁষা কয়েদীটি আমার দিকে সরে আসে—আমাকে সান্ত্বনা দিতে চায়।

'হ্যাঁ, হুট করে তুমি কাজটা করে ফেলেছ। জানো কি. যাদের ফাঁসির সাজা হয় তারা আরও কিছুকাল বেঁচে যেতে পারে হয়ত তিন মাস কি ছ মাস। মানে যতদিন বিচার চলে। আর সে চেষ্টা ওরা করবে কি না সেটা কেউ আগে থেকে জানতে পারে না।'

কথাটা আমার ভাল মতই জানা ছিল। থানার হাজতে যখন ছিলাম তখন সেখানে এক স্যাঙাৎ জুটেছিল—সে ছিল এক প্রবঞ্চক। সে নাকি একবার যখন জেলে ছিল তখন তার সঙ্গে ছিল একজন ফাঁসীর আসামী। নিজের পোষ্য নেওয়া ছেলেকে খুন করার দরুণ ফাঁসীর হুকুম হয়েছিল। সেই শিশুঘাতকেরও অন্যের বরাদ্দ খাবার কেড়ে খাওয়ার দিকে ঝোঁক ছিল। কেউ আপত্তি করলে হাতে একটা তোয়ালে নিয়ে নিংড়াতো আর বলত, এতদূর যখন গড়ালো, তখন না হয় আর দুটো বেশিই হল। বিড় বিড় করে যখন কথাগুলো আওড়াতো তখন তার কুটিল চোখ দুটো দিয়ে সেই লোকটার গলার দিকে তাকাত যাকে কথাগুলো শোনাচ্ছে। তাই সবাই খাবারের

থেকে ওকে খানিকটা ভাগ দিয়ে দিত।

আমি মুষড়ে পড়েছি দেখে বুদ্ধিজীবী, তার নিজের মাদুরে বসে তখনো বাক্সের ঢাকনাটা পালিস করতে করতে বলল ঃ

'মাফ চেয়ে নাও। তোমার মাফ চাওয়াই উচিত।'

'ঠিক কথা। মাফ চাইবে কিন্তু খুব সাবধানে। তারপর···'

কী কারণে যেন চল্লিশ ঘেঁষা ওকে থামিয়ে দিল। ওর চোখ দুটো ধূর্ত-তায় ঝলসে উঠল—আড়চোখে আমার দিকে ও তাকালো। 'ফাঁসীর আসামী যতদিন এই গারদটাতে থাকবে। ততদিন তো বাড়তি খাবার আসতেই থাকবে। তাই ওকে একটু তোয়াজ করেই চললেই তো কারো লোকসান হচ্ছে না।'

আমি বুঝতে পারছিলাম যে আপাত দয়া দেখিয়ে এরা যা বলছে সেটাই সত্যি। কিন্তু নিজেকে আমি তো চিনি। তাই আমার স্থির বিশ্বাস ছিল যে একটু আগে যাকে গালি গালাজ করেছি তার কাছে মাফ চাওয়া আমার দ্বারা হয়ে উঠবে না। মনের মধ্যে দ্বন্দ্ব নিয়ে গোটা বিকেলটা কাটালাম।

সরদার গারদে ফিরল খানিক বাদে। ওর চোখ মুখের রং এখন প্রফুল্ল। কথাবার্তা বলছে বেশ স্বস্তির সঙ্গে।

একটু পরে রাত নামল। শুতে যাবার সময় আর এক ফ্যাসাদ। দিনের বেলায় গারদের মধ্যে একটা অলিখিত নিয়ম থাকে যার ফলে বয়সের গুরুত্বের সঙ্গে কে কোন জায়গায় বসে বা শুয়ে থাকবে সেটা নির্ধারিত হয়—সরদার কয়েদি দরজার কাছে, তার পরের বয়স্ক যেজন সে তার পাশে এইভাবে জায়গা ঠিক থাকে। রাত্রে কিন্তু কারাগারের নিয়ম মাফিক বন্দীদের শুতে হবে তাদের নম্বর অনুসারে।

তার মানে সরদার কয়েদির নম্বর সবচেয়ে ছোট 170 (—) তার শোবার জায়গা হল ঘরের শেষপ্রান্তে। তারপর আমার নম্বর 178 আমাকে শুতে হবে ওর পাশে।

সে রাত্রে ঘুম হওয়ার প্রশ্নই উঠল না। সে লোকটা ঘুমিয়েছিল কিনা

জানি না। ও নড়েনি, পাশ ফেরেনি, চিৎপাত হয়ে পড়ে থেকেছে। ওর শীর্ণ দেহ কাঠামো, ফ্যাকাশে, রুক্ষ ত্বকের উপর ইলেকট্রিক বাতির আলো অবাধে পড়েছিল ! নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের শব্দ যেন হাপরের মধ্যে দিয়ে বাতাসের ঢোকা আর বেরিয়ে আসা।

আমি শুনেছিলাম যে পাঁচ নম্বর ব্লকে আরো দুজন ফাঁসীর আসামী ছিল তবে তাদের পক্ষে চূড়ান্ত রায় বেরোনো বাকি ছিল। চিৎকারগুলো আসছিল বোধহয় ওদিক থেকেই ভয়ে। দুশ্চিন্তায় ঘুমের মধ্যে তারা দুঃস্বপ্ন দেখে চেঁচিয়ে উঠেছিল। প্রত্যেকবার চিৎকারের পরেই পাহারাদারের পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছিল—চিৎকার করে ওঠা লোকটাকে জাগিয়ে দিচ্ছিল।

সকাল হল। বিছানায় আমরা শুয়ে থাকতে পারি যতক্ষণ না পাহারাদার এসে 'উঠে পড়', 'উঠে পড়' বলে শোর তুলছে। কিন্তু 170 নম্বর অনেক-ক্ষণ উঠে পড়েছে, বসে আছে আমার পাশেই। আমিও উঠে পড়লাম। ওর মুখের দিকে একবার তাকাতে গিয়ে বিস্ময়ে চমকে উঠলাম। ওর মুখখানা এক একবারে ছাই-এর মত ফ্যাকাশে মনে হচ্ছে, ওর মুখের ত্বক বুঝি স্বচ্ছ। জ্যান্ত মানুষের মুখ এমন হতে পারে না।

শয্যাত্যাগের হুকুম পেয়ে যে যার পাতলা বিছানাগুলো তুলে ফেলে বেঁটে খাটো ঝাড়ু দিয়ে মেঝেটা ঝেঁটিয়ে নেয়—হেঁটে যাবার পাটাতনটা মুছে দিতেও হয়। কিন্তু 170 নম্বর মানে মনিব কয়েদি গারদের দরজার দিকে তাকিয়ে চুপচাপ বসে থাকে।

'ওর কী হয়েছে ?' আমি শুধাই চল্লিশ-ঘেষা সঙ্গীকে, যার সঙ্গে গতকাল আলাপ হয়েছে। 'ফাঁসীর হুকুমনামাটা যে কোনদিন এসে পড়তে পারে কিনা। আর এই সকাল বেলাতেই পাহারাদারদের ডিউটি বদলের সময়ই আসে কিনা। উদ্বেগ তো থাকবেই।'

যেন পরিস্থিতিটা বুঝতে পেরেছি এমনি দু-এক কথা আমিও আওড়ালাম। কিন্তু ভেতরে ভেতরে আমিও রক্তশূন্য হয়ে যাচ্ছিলাম। আমার কাঁপুনি শুরু হয়েছিল।

এই মানুষটার জীবনের এক একটা মিনিট এখন জলের স্রোতের মত যে জীবন ও কাটিয়ে এসেছে এতকাল তার এক একটা বছরের সমান। গরীব লোকেদের সব সময়ই বয়সের চেয়ে বুড়ো দেখায়। তা হলেও এই লোকটার বয়স পঞ্চাশের থেকে বেশি হবে না। ওর স্বাভাবিক জীবৎকালটা যদি ও বেঁচে থাকত তাহলে এখনও পনের কি বিশ বছরের জীবন ওর বাকি রয়েছে। সেই চেষ্টাই হয়ত ও এখন করছে।

সকলের জলখাবারের সময় এল। বুদ্ধিজীবী আবার তার চকচকে বাক্সের ঢাকনাটা বাড়িয়ে দিল, এগিয়ে দেওয়া আর একটা ঢাকনা সরিয়ে দিয়ে: সরদার কয়েদীর হাতে ওরটা পেঁাছে দিল। যেন এটা ওর একটা ব্যক্তিগত অধিকার এই নিয়ে রাতের খাবার দেওয়ার সময় যেমন দেখা গিয়েছিল তেমন আর এক জনের সঙ্গে ওর একটু রেশারেশিও যেন হয়ে গেল। আমার মনে হল নোংরা ঢাকনাটা বার বার বাড়িয়ে দিচ্ছে যে লোকটা, ঠেলে সরিয়ে দেওয়া হবে জেনেও সেই লোকটা বুদ্ধিজীবীর চেয়ে বেশি লোভী।

চাকর-কয়েদী হাতায় করে স্যুপ ঢেলে দিচ্ছিল। হাতাটা বড়ো, বাটিগুলো ছোট। কিছুটা করে স্যুপ উপচে পড়ে যাচ্ছিল। তাই সকলকে স্যুপ পরিবেশন করা হয়ে গেল, বেশ কিছুটা উপচে পড়া স্যুপ ঢাকনাটাতে জমা হয়েছিল।

গারদের সরদারের কাছ থেকে ঢাকনাটা ফেরত নিয়ে বুদ্ধিজীবী সন্তর্পণে ফিরে এল নিজের মাদুরে। ঢাকনাটা কাৎ করে স্যুপটা চুমুক দিয়ে সাবড়ে দিল—তারপর পরমানন্দে ঠোঁট টানতে লাগল—গারদের সরদার পাথরের মূর্তির মত বসেই রইল।

সরদার কয়েদির দিকে আমি ফিরে তাকালাম। ওর সামনে সারি দেওয়া ওর নিজের খাবার আর দুটো বাড়তি খাবার। ওর কিন্তু নিজের চপস্টিক বের করে খেতে আরম্ভ করার কোন উদ্যোগই নেই—দরজায় ঠেসান দিয়ে যেমন বসেছিল, তেমনি বসেই রইল। আমি ভাবছিলাম ওর পেয়ারের কোন কয়েদীর সঙ্গে ভাগাভাগি করে খেতে বসবে কি না—কিন্তু সেরকম কিছুই

করল না। একটু পরে ও উঠল, তিনটে খাবার উঠিয়ে নিয়ে নিজের জিনিস-পত্তরের সঙ্গে গুছিয়ে রাখল।

সময় বয়ে যায়। নটা বোধহয় বেজে গেছে। কেননা বাইরে করিডরে দিনের পাহারাদারদের গলার স্বর শোনা যাচ্ছিল। আমরা রোজই তাদের গলায় আওয়াজ শুনতে পেতাম কিন্তু তবুও নতুন পাহারাদারদের গলার শব্দ রোজই তাজা লাগত, ভোরের চড়াইপাখিদের কিচির মিচিরের মতই।

'নটা বেজে গেছে।' কে যেন বলল, সরদার কয়েদীকে জানিয়ে দিতে চায় যে আশঙ্কার কালটা পেরিয়ে গেছে।

সরদার কিন্তু সে কথা আগেই জেনে গেছে। সে কোন উত্তর দিল না। কেবল চট করে উঠে গিয়ে নিজের খাবারটা নামিয়ে আনল। কয়েক মুহূর্ত আগে যেটা ও তাকের উপর তুলে রেখে এসেছিল।

ওর মুখের ফ্যাকাশে রং আর ভয়জাগানো হাবভাব লক্ষ্য করে দেখা মানে যেন এক কঠিন বোঝা বয়ে বেড়ানো। ওর সঙ্গে আমরা সবাই যেন সেই বিপদ সংকুল একটি ঘন্টা অন্য কোথাও চলে যেতে চাইতাম।

ও খাচ্ছিল। এক মুহূর্ত আগে এক দলা খাবারও মুখে তুলতে পারে নি। আর এখন কেমন গোগ্রাসে পরম পরিতোষের সঙ্গে খাবারগুলো মুখের মধ্যে পাচার করে দিচ্ছে। নিজের ভাগেরটা দেখতে না দেখতে শেষ—কয়েক মিনিটের মধ্যে অন্য দুটো ভাগও। দেখা গেল বেশ খেতে পারে। মন মেজাজও আবার বেশ তাজা হয়েছে।

কথাটা উঠল আবার যখন কে যেন আমাকে শুধালো : 'তা তুমি এখানে ঢুকলে কী করে?'

বেশ কয়েক মিনিট ধরে আলোচনা চলল আমার কীর্তিকলাপ নিয়েই।

'আচ্ছা, ওস্তাদ তুমি তো কোনদিন বললে না ভাল করে তোমার খুন বলাৎকার আর রাস্তার ওপর নোংরামির কেচ্ছাগুলোর কথা?' সরদার কয়েদী বেশ খোসমেজাজে রয়েছে দেখে কে যেন ওকে জিগগেস করল। বস্তুত পক্ষে ঠিক এই একই রগরগে কেচ্ছার খুঁটিনাটি আমিও জানতে চাইছিলাম।

মনিব কয়েদীর প্রসন্ন মুখ হঠাৎ গম্ভীর হয়ে যায়।

'ও কথা আমাকে কেউ শুধিও না।'

ওর গলার স্বর বেশ ভারী। বেশ কিছুক্ষণ ধরে আমি ওর দিকে বারবার তাকাচ্ছিলাম। আমি তরতাজা জোয়ান, আমার চোখে মুখে ফুটে উঠেছিল প্রসন্নতা। এইভাবে ওর দিকে বার বার তাকিয়ে আমি ওকে বোঝাতে চাই-ছিলাম যে আমি মিটিয়ে নিতে চাই। আমাকে মেরে ফেললেও কথাগুলো আমার মুখ ফুটে বেরোবে না। তাই এই রকম চালাকি করেই আমি নিজের আচরণ শুধতে নিতে চাইছিলাম।

খানিক পরে ওকে ব্যায়াম করতে বাইরে নিয়ে গেল।

'ডাকাতি, ধর্ষণ, সর্বসমক্ষে নোংরামি, আসলে কী করেছিল ও?' আমি জিজ্ঞেস করলাম চল্লিশ-ঘেষা কয়েদিটিকে। একবার শুনেই সরদার কয়েদী অপরাধের ফিরিস্তিটা আমার মুখস্ত হয়ে গিয়েছিল।

'আসলে ও নিজে ব্যাপারটা যতই গোপন রাখতে চাক না কেন, গোপন তেমন নেই—এই দেখ না।'

সরদার কয়েদীর জিনিসপত্তরের ভেতর থেকে একখানা কাগজ টেনে বের করল। নিচের কোর্টে ওর মামলাটার বিচার ও ফয়সলার দস্তাবেজ ছিল সেই কাগজটা। বাকি সবাই সেটা আগেই দেখেছে—আমি হাত বাড়িয়ে কাগজটা নিলাম। আইনের খটোমটো ভাষায় সেটা লেখা। তবে পড়তে গোটা ছবিটা আমার কাছে একটু একটু করে পরিষ্কার হচ্ছিল।

সময়টা বসন্তকাল। দৃশ্য উত্তর কানটো জেলার পাইনের সবুজ বনানী। চিরহরিৎ বৃক্ষরাজির মধ্যে অনেক বসন্তের ফুল ফুটেছে। চেসটনাটের মুকুলের তীব্র গন্ধ নাকে আসছে। কাছাকাছি কোন কুঞ্জ থেকে শ্যামা পাখির মধুর সংগীত শোনা যাচ্ছে। বাতাসে শেষ বসন্তের রেশ যেন কোমল দেহের স্পর্শ বুলিয়ে দিচ্ছে।

বনের ওধার থেকে কিছুক্ষণ ধরেই কমবয়সী মেয়েদের তীক্ষ্ম কলকণ্ঠ

শোনা যাচ্ছিল। একটু পরেই খাড়া দাঁড়িয়ে থাকা স্প্রুস গাছের সারির ফাঁকে দিয়ে পাহাড় থেকে নেমে আসা একদল মেয়ের স্কুলের ইউনিফর্ম চেনা যাচ্ছিল।

'পিকনিক করতে এসেছে বোধ হয়।'

দুজন মজুর পাথরের ওপর বসে বসে ধূমপান করছিল—ওরা যাবে পাহাড়ের মাথায় একটা বিদ্যুৎ কেন্দ্র তৈরি হচ্ছে সেখানে কাজ করতে।

'পাহাড়ের চূড়োয় এখনো বরফ থাকার কথা।'

'না এখন আর নেই। আজেলিয়া ফুটেছে দেখছ না।'

দুজনে চুপ করে যায়। অর্থপূর্ণ নীরবতা।

ঠিক তখনই ঃ 'যা, না। সোজা ঢুকে যাবি। পেছন দিকে তাকাবি না। যা।'

দলটা ছেড়ে আসার কালে হাত নেড়ে একটি স্কুলের মেয়ে, বছর আঠার বয়স কতকগুলে গাছের আড়ালে ঢুকে যায়। মজুর দুজন যেখানে বসেছিল তার সামনে একটা ঝোপ, শুকিয়ে আসা উলুখাগড়ার ঝোপ। ডাঁটাগুলো ধুসর, ভেঙে ভেঙে পড়ছে, গোড়ার দিকে এখনো কিছুটা সবুজ। স্কুলের মেয়েটির ভাবনা কেবল ওর সঙ্গিনীদের দিকে। তারা ওকে দেখতে পাচ্ছে কিনা। ইজের নামিয়ে ও বসে পড়ল। ওর সাদা ক্যালিকোর জামা শুধু দেখা যাচ্ছিল।

মজুর দুজনের একজন অন্যজনকে কি যেন বলল চুপি চুপি। উত্তর না দিয়ে অন্যজন উঠে পড়ে তারপর দ্রুত সরে যায়। অন্যজন লাফিয়ে নেমে আসে স্কুলের মেয়েটার সামনে—ও তখনও উবু হয়ে বসে ছিল। ঘাসের ডাটাগুলো মট মট করে ভেঙে যাবার শব্দ শোনা যাচ্ছিল। অল্পক্ষণের মধ্যেই মেয়েটার বাধাদান নিরর্থক হয়ে যায়। তার আর্ত চিৎকার হয়ত স্প্রুস গাছের ডালে ডালে প্রতিধ্বনি :তুলেছিল। কয়েক মিনিটের মামলা। তারপর অন্য মজুরটি যে এতক্ষণ চৌকি দিচ্ছিল ফিরে এসে প্রথমজনের সঙ্গে জায়গা বদল করে নেয়। সেই হল 170 নম্বর। আমাদের সরদার কয়েদী।

স্কুলের মেয়েটা চিৎ হয়ে পড়েছিল। ওর মুখখানা শূন্যের দিকে তোলা —কোমল চুলগুলো, কাদায় ভেজা। দ্বিতীয়জনও করে গেল প্রথমজন যা করেছিল। স্কুলের মেয়েটা সংজ্ঞা হারিয়েছিল। ওর টিকলো নাকের সূক্ষ্ম ফুটো দিয়ে নিঃশ্বাস পড়ছিল মৃদু স্বরের মত।

ওর চওড়া হাতের পাঞ্জা দিয়ে মজুরটা মেয়েটাকে শ্বাসরুদ্ধ করে দিল। তারপর ও উঠে পড়ল। উঠে পড়ার সময় দেখতে পেল মেয়েটার ছোট্ট লাল রঙের পয়সার ব্যাগটা পড়ে রয়েছে কয়েক ফুট দূরে। ব্যাগের ভেতরটা নানান অঙ্কের নোট দিয়ে ঠাসা তাই মুখটা বন্ধ করা যায়নি। ব্যাগটা ও তুলে নিয়ে কোমর বন্দের মধ্যে রেখে দিল।

দুজনে দেহটাকে টেনে আনে নরম মাটিতে। তারপর সেখানে কবর দেয়। সন্তর্পণে ওরা বেরিয়ে এসে দুজনে দুদিকে চলে যায়। হয়ত অন্যজন মেয়েটাকে মেরে ফেলার কথা ভাবেনি।

রাত যখন নামে তখন এমন একটা মুহূর্ত আগে যখন সবাই একটু উতলা হয়ে যায়। লক্ষ করলাম সর্দার কয়েদী দেওয়ালের দিকে মুখ করে সম্পূর্ণ স্থির হয়ে বসে রয়েছে। বসে বসে একটা বৌদ্ধ প্রার্থনা মন্ত্র অস্ফুট স্বরে আউড়ে চলেছে। আগের রাত্রে তার আগের রাত্রের থেকে সামান্যই ভাল ঘুম হয়েছিল। মাঝে মাঝে ওই লোকটা পাশ ফিরতে গিয়ে আমাকে লাথি মেরেছে। চমকে আমি জেগে উঠেছি, যেন কেউ গায়ে ঠাণ্ডা জল ঢেলে দিয়েছে। আমাকে ক্ষমা করে থাকলেও, মানে যদিই বা ক্ষমা করে থাকে তাহলেও আর একটা খুন করবার অজুহাত খুঁজতে হলে আমাকেই পাবে হাতের নাগালে তাই সেই খুনের নিমিত্ত আমারই হওয়ার মৌকা সবচেয়ে বেশি।

তবে অস্বাভাবিক কিছুই ঘটছিল না। সকাল হলেই নিত্য দিনের সেই যন্ত্রণা আমাদের পক্ষে যেটা সহ্য করা ক্রমশ অসহ্য হয়ে উঠছিল। আবার দুপুর হলেই লোকটা খেতেও পারত কেবল নিজের খাবারই নয় আরো কয়েক জনের ভাগের খাবারও।

একদিন সুযোগও এসে গেল ওর সঙ্গে মিটমাট করে নেবার।

'চিন্তা কোরো না, আমি বললাম।' শিগগিরই যুদ্ধে আমরা জিতছিতো আর তারপরে সবাই একবার ক্ষমা পেয়ে যাবে।

নেহাৎই ছেঁদো কথা। কিন্তু ওর সঙ্গে কোন কথা বলতে গেলে এছাড়া আর কীইবা বলতে পারতাম আমি।

'তুমি তাই মনে করছ ? কিন্তু ছাড়া যদি পাই, পরবার জামা কাপড় তো আমার কিছুই থাকবে না।'

পরনের জামা কাপড়ের জন্যে তোমায় ভাবতে হবে না। অনেকদিন আগে একবার বন্দী মুক্তি ঘটেছিল। সেই যে বার নতুন সংবিধান ঘোষণা করা হয়। জেলের বাইরে সেবার একটা নতুন বাজারই উঠে আসে। আমি তোমাকে কিছু টাকা ধার দেবখন।

তারপর একদিন সকালে আটটা নাগাত ঃ

'নম্বর একশ আট—বাড়ির লোক।'

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে দরজাটা খুলে যায়। 170 নম্বরের মুখের ভাবখানা আমি কোন দিন ভুলব না। প্রহরী যখন বলছিন 'একশ...' আর তার পর যোগ করছিল 'আট'। ওর মুখখানা খড়ির মত শাদা হয়ে যায়, চোখ দুটো ওপরে উঠে যায়, ওর সারা শরীরটা কেঁপে কেঁপে উঠতে থাকে। কিন্তু না। আসলে আমার দলেরই একজন লোক এসেছিল আমার সঙ্গে দেখা করতে। পরের দিন সকালে একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি। ওর সন্ত্রস্ত, ভয়চকিত মূর্তি আমি যেন আর দেখতে পারছিলাম না।

কোন কারণ না দেখিয়ে কাওয়ানাকার দলের লোকটাকে আমি বলেছিলাম আমার সঙ্গে যেন দেখা করতে আর না আসে। সরদার কয়েদীকে কেমন যেন ভালবাসতে শুরু করেছিলাম। কারণটা বললে আপনি হয়ত হাসবেন। হয়ত ঠিক বুঝতেও পারবেন না। এক সময় বলতে গেলে কারণটা হল এই যে ও আমাকে খুন করবে না।

নিজের মনের মধ্যে বার বার আমি চিন্তা করেছি যে মানসিকতা নিয়ে আমি খুন করেছি শিডাকে আর যে মানসিকতা নিয়ে সরদার-কয়েদী খুন

করেছে স্কুলের মেয়েটাকে। এই কাজগুলো করা হয়ে গেছে। এখন আর তাদের নিষ্পন্ন হবার আগের অবস্থায় ফেরানো যায় না। কিন্তু এটা কি আশ্চর্যের কথা নয় যে এই লোকটা আমাকে খুন করার ইচ্ছাটা ত্যাগ করেছে। ও আমার পাশে শুয়ে ঘুমোচ্ছে আর এইভাবে আরো কিছুকাল বেঁচে থাকার সুযোগটা হারাচ্ছে? এটা কি এক পরম বিস্ময়ের ব্যাপার নয় যে মানুষ যুক্তি বিনাই খুন করতে পারছে না, এমনকি তখনও যখন বেঁচে থাকার বাসনার জ্বালায় সে জ্বলে পুড়ে যাচ্ছে?

চল্লিশোর্ধ বিজ্ঞ লোকটিকে আমি শুধালাম, 'আমি শুনেছি যে যাদের ফাঁসীর হুকুম হয়েছে এমন বন্দীদের কেউ কেউ নাকি গারদের অন্য কারোকে খুন করার কথা চিন্তা করে থাকে। আচ্ছা সত্যি সত্যি কখনো এমন ব্যাপারটা ঘটেছে?'

'দেখ, সবাই এমনি কথা বলে থাকে বটে, কিন্তু কোন সত্যি ঘটনার কথা আমি তো কখনো শুনিনি।'

কেন জানিনা বেশ পরিতৃপ্তির সঙ্গে ভাবতে পারলাম, 'সত্যিই তো।'

কয়েকদিন বাদে সকালবেলা। বাইরে একজন লোক চিঠি লিখছিল। একজন রক্ষী চীৎকার করে তাকে হুকুম জানায়, 'লেখা বন্ধ কর।'

আমিই সকলের আগে চমকে উঠলাম। যখন নির্জন কারাবাস চলছিল, তখন একদিন এমনি একটা হুকুম আমি হঠাৎ শুনেছিলাম-'লেখা বন্ধ কর।' হুকুমটার মানে কী হতে পারে ভাবতে ভাবতে এক চাকর কয়েদীকে জিগগেস করেছিলাম।

'গতকাল চৌকিদার ফাঁসীকাঠটার নীচের কামরাটা ঝাঁট দিয়ে সাফা করছিল। তার মানে আজ একটা ফাঁসি হবে। বোধহয় সেই জার্মান গুপ্তচরটা হবে। ওর শাস্তিটা তো এই কদিন হল পাকা হয়েছে।'

এই কথাগুলো মনে মনে স্মরণ করতে করতে আমার মনে হল, 'তাহলে এই বার।' 170 নম্বরের দিকে একবার তাকিয়ে নিলাম। পাঁচ নম্বর ব্লকের গারদগুলোতে তিন জন লোকের ফাঁসির হুকুম হয়েছে। তার মধ্যে কেবল

170 নম্বরেরই শাস্তিটা পাকা হয়েছে।

'বোধহয় একটা সংবাদ বুলেটিন প্রচার হবে।' কে যেন বলছিল। তবে নিঃসন্দেহে তেমন কিছু ব্যাপার আদৌ নয়।

একটু পরেই বাইরে পায়ের শব্দ শোনা যায়। দুজন রক্ষী আমাদের সেলের দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

'170 নম্বর-বাড়ির লোক।'

সরদার কয়েদীর মুখ ছাই-এর বর্ণ। ও একেবারে নিথর হয়ে গেছে।

'বেরিয়ে এসো, 170 নম্বর! বেরিয়ে এসো, বাড়ির লোক।'

রক্ষী দুজন ভেতরে চলে আসে জুতো না খুলেই। ওরা 170 নম্বরকে খাড়া করে দাঁড় করিয়ে দেয়, দুদিক থেকে দুজনে ধরে থাকে। টলতে টলতে হুমড়ি খেতে খেতে 170 নম্বর সেলের দরজা পর্যন্ত যায়। একজন রক্ষী ওকে ঘাসের চটি জোড়া পরে নিতে বলে। কিন্তু ওর পাগুলো কাঁপছিল তাই চটিগুলো ও পায়ে রাখতে পারেনি। দুদিক থেকে দুজন পাহারাদার ধরে থাকা অবস্থায় প্যাসেজ দিয়ে ওকে নিয়ে যাওয়া হয় মেয়েদের গারদগুলোর পাশ দিয়ে। ঘাসের চটী দুটো কনক্রিটের করিডরের ওপর পড়েছিল সেখানেই, এক পা দূরত্বের মধ্যে দুই পাটি।

'আজ কোন পাহারাদার দড়িটা টানবে কে জানে। একবার দড়ি ধরে টানলেই সে পাবে এক বোতল সাকে, কিছু খাবারদাবার আর বাকি দিনটা ছুটি।'

চল্লিশ-ঘেঁষা কয়েদী ওর জ্ঞানের পরিধি নিয়ে বেশ যেন গর্বিত। আমার মুখখানা শাদা হয়ে গিয়েছিল। ইচ্ছে হচ্ছিল ওকে একটা চড় কসিয়ে দিই। কিন্তু আমি চুপ করে রইলাম। মাথাটা হেঁট করে।

পরিচিতি: হীরাবায়াশি তাইকো

কেন্দ্রীয় জাপানের পার্বত্য অঞ্চল নাগামো জেলায় 1805 সালে শ্রীমতী হিরাবায়াশি তাইকো-র জন্ম। আধুনিক জাপানের বেশ কয়েকজন প্রথিতযশা

বিশ্বান ও সাহিত্য সেবীর জন্ম এই নাগানো অঞ্চলে। এখানকার পার্বত্য নিসর্গ যেমন মনোহর ঠিক তেমনি এখানকার মানুষজনের উদার স্বাধীনচেতা মন।

শ্রীমতী তাইকোর বাল্যকালেই পারিবারিক দুর্দশার মধ্যে পড়তে হয়। অন্য ভাই বোনেরা প্রাইমারী স্কুল পর্যন্ত লেখাপড়া করলেও লেখিকা বাড়ির কারোকে না জানিয়ে মাধ্যমিকের প্রবেশিকা পরীক্ষায় বসেন এবং একেবারে শীর্ষভাগে স্থান পান। উচ্চমাধ্যমিক পড়া শেষ করে টোকিও যান এবং নানান পেশায় একে একে কাজ করেন;যেমন টেলিফোনঅপারেটর, রেঁস্তোরার ওয়েট্রেস, ধনীর বাড়িতে দাসী। স্কুলে থাকতেই রাশিয়ান লেখকদের রচনাবলীর সঙ্গে পরিচয় ঘটে। সমাজবাদী চিন্তানায়ক ও লেখকদের ভাবনা চিন্তার সঙ্গেও। এই সময় অর্থাৎ টোকিওতে আসার পরে তাঁর পরিচয় ঘটে এক সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠীর সঙ্গে।

অল্প বয়স থেকেই মন থেকে স্থির করেছিলেন যে লেখাই হবে তাঁর জীবিকা—লেখা মানে রূপকথা, রোমাঞ্চকর গোয়েন্দা কাহিনী। তাঁর উপন্যাস To Mock আসাহি শিমবুন-এর পৃষ্ঠপোষকতায় এক প্রতিযোগিতায় প্রাইজ পেয়েছিল 1927 সালে। ওই একই বছরে প্রকাশিত In the Charitable Hospital উপন্যাসে জনগণের লেখিকা বলে খ্যাতি আসে।

বামপন্থী সাহিত্য এর পরে জনপ্রিয়তা হারায়। 1937 সালে এসে পড়ে চীন জাপান সংঘর্ষ। শ্রীমতী তাইকো নিদারুণ দারিদ্রে পড়ে যান। জেলে থাকাকালে কোন ব্যাধির কবলে পড়ে আট বছর ধরে শয্যাশায়ী ছিলেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে শ্রীমতী তাইকো আবার লিখতে শুরু করেন। এবার শ্রেণী সংগ্রাম থেকে তাঁর রচনার উত্তরণ হয় মানবিকতার দিকদর্শনে। Song of the underworld গ্রন্থে জুয়াড়ীদের জীবনধারা বিধৃত হয়েছে। এখানে তাঁর রচনায় মননের পরিণতি, প্রেক্ষণের প্রসার আর কারুকর্মের স্ফূর্তি লক্ষণীয়।

বর্তমান গল্পটি (Hito no Inochi) প্রথম প্রকাশিত হয় 1950 সালে। বলা চলে তাঁর যুদ্ধোত্তর রচনার নিদর্শন এই গল্পটি।

ব্যাঘ্র কবি : নাকাজিমা তন

লি চেং পণ্ডিত মানুষ। প্রথম যৌবনেই সিনিয়র সিভিল সার্ভিস পরীক্ষাতে সসম্মানে উত্তীর্ণ হলে পরে নাম উঠল মিলিটারি চাকরীর তালিকায়। অল্পদিনের মধ্যে ইয়াংসির নিম্নাঞ্চলের ক্যাপটেন অফ দ গার্ডস-এর পদে নিযুক্তিও নির্বিঘ্নে ঘটে গেল।

চাকরী নিল বটে কিন্তু নতুন পদের বাধ্যবাধকতায় তার মুক্ত প্রকৃতি, বেপরোয়া মন অতিষ্ঠ হয়ে উঠতে লাগল। নিজের প্রতিভার মাপ কাঠিতে চাকরীটা নেহাৎ মামুলি বলে মনে একটা হেনস্থার ভাব আসতে লাগল। চটপট যে প্রমোশন পাবে তারও সম্ভাবনা নেই, তাই কিছুকালের মধ্যেই লি চেং সরকারী চাকরী থেকে ইস্তফা দিল। চাকরীর সূত্রে যাদের যাদের সঙ্গে পরিচয় সেই সব বন্ধু বান্ধব সহকর্মী সুহৃদ সকলের সঙ্গে মেলামেশা যোগাযোগ সব চুকিয়ে দিয়ে দেশের বাড়িতে কুয়োলাব শহরে ফিরে গেল। এখন থেকে সর্বতোভাবে কাব্য রচনা করবে বলে মন স্থির করে ফেলল। বছরের পর বছর ধরে নীচু পদের চাকরীতে তথাকথিত ওপরওয়ালাদের সামনে মাথা নুইয়ে দিন পাত করার চেয়ে স্বাধীনভাবে লেখকের বৃত্তি নিয়ে আর আখেরে বড় কবি হিসেবে চিরস্থায়ী নাম রেখে যাওয়া, অনেক সম্মানের, অনেক দিক থেকে কাম্য নয় কি? মনের ভাবখানা ওর এমনিই হয়েছিল।

কিন্তু, আক্ষেপের বিষয় হল এই যে লেখক হিসেবে সার্থক হতে গেলে শুধু সংকল্পের অতিরিক্ত অনেক কিছু লাগে। অল্পদিনেই জমানো টাকা কড়ি ফুরিয়ে গেল। তারপর থেকে ওর দিনগুলি ব্যবহারিক জীবনের নানাবিধ লড়াই-এর মধ্যে দিয়ে কাটতে লাগল। সুদর্শন, গোলগাল, মেধাবী যুবকটি যে কিনা কৃতিত্বের সঙ্গে সিবিলসার্বিস পরীক্ষা পাশ করেছে—এই ছবিটি মিলিয়ে গেল। সেই জায়গায় দেখা দিল পাংশু মুখ শীর্ণ রুক্ষ

মেজাজের এক চেহারা, যার তীক্ষ্ম চোখের অধৈর্য দৃষ্টি থেকে চেনা যায় এমন এক মানুষকে যার জীবনের লক্ষ্য যেন ক্রমশই দূরে সরে যাচ্ছে।

কয়েক বছর যেতে কাব্য রচনার দরুণ এসে পড়া হাড়ভাঙা দারিদ্র একেবারে অসহ্য হয়ে উঠল। মনে মনে টের পেল নিজের আর পরিবারের জন্যে অন্ন বস্ত্রের সংস্থান করতে অহংকার গিলে ফেলে একটা চাকরী জুটিয়ে নেওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। সিবিল সার্ভিস বোর্ডের কাছে ও একখানা দরখাস্ত পাঠালো। অল্প দিনের মধ্যেই আবার চাকরি পেল। পূবের একটা জেলার সহকারী জেলা অফিসারের পদ। ততদিনে ওর পুরানো সহকর্মীরা সবাই উঁচু উঁচু পদে প্রমোশন পেয়ে গেছে। লি চেং এখন দেখল সিবিল সার্ভিস পরীক্ষায় যারা ওর চেয়ে অনেক কম নম্বর পেয়ে লিসটের তলার দিকে ছিল, যাদের ও নিরেট বোকা বলে তাচ্ছিল্য করে এসেছে, তাদের হুকুম তামিল করতে হচ্ছে। নতুন পরিস্থিতিতে নিরন্তর আত্মনিগ্রহ, বিশেষত এতগুলি দুরূহ বছর কবি হিসেবে কাটিয়ে আসার পরে লি চেঙকে যার পর নাই বিষাদগ্রস্ত আর তিতবিরক্ত করে তুলেছিল। সময় সময় ওর মনে হত বুঝি পাগল হয়ে যাবে।

সিবিল সার্ভিসে আবার যোগ দেবার বছর খানেক বাদে, সরকারী কাজে একবার ওকে দক্ষিণে পাঠানো হয়েছিল। পথে, জু নদীর সংলগ্ন এক সরাইখানায় রাত কাটাতে হয়েছিল। সেই সময় হঠাৎ ও উন্মাদ হয়ে যায়। মাঝ রাত্তিরে বিকট স্বরে চিৎকার করে ওঠে। মুখ চোখ বিকৃত করে, কটমট করে তাকাতে তাকাতে জানালা দিয়ে বাইরে ঝাঁপিয়ে পড়ে, কেউ বাধা দেবার আগেই অন্ধকারের মধ্যে মিলিয়ে যায়। সকালে ওকে খুঁজে আনতে একদল লোক পাঠানো হয়েছিল। লি চেঙের কোন চিহ্ন কোথাও তারা খুঁজে পায় নি। আর তাকে কেউ কখনো দেখেনি। ওর বাড়ির লোকজনও কোনদিন জানতে পারেনি কী ঘটেছিল ওর ভাগ্যে।

পরের বছর সেই অঞ্চলের আদম সুমারী বিভাগের এক সুপারভাইজার নাম ইউয়ান চান রাষ্ট্রীয় কাজে দক্ষিণাঞ্চলে সফর করার কালে জু নদীর ধারে শাঙইয়ুতে রাতের আশ্রয় নিয়েছিল। পরের দিন ভোরের আগে রওনা হতে

যাবে এমন সময় গৃহস্বামী ওকে সাবধান করে দিল যে দক্ষিণের রাস্তায় নাকি কিছুকাল থেকে একটা মানুষ খেকো বাঘের দেখা পাওয়া যাচ্ছে।

'পথিকদের তাই সাবধান করে দেওয়া হয় যে রাত বিরেতে ওই রাস্তাটা এড়িয়ে যাওয়াই ভাল।' গৃহস্বামী বললে, 'ধর্মাধিকারের প্রতি সসম্ভ্রমে নিবেদন করছি, যে দিনের আলো ফুটে ওঠা পর্যন্ত অপেক্ষা করে গেলে ভাল হয়।'

'ধন্যবাদ', ইউয়ান চান বললে, 'কিন্তু আমার সঙ্গে তো একদল নির্ভিক দেহরক্ষী রয়েছে।' বৃথা বাক্যব্যয় না করে ও ঘোড়ায় উঠে সরাই ছেড়ে রওনা দিল, দলবল চলল সঙ্গে।

কিছুক্ষণ পর থেকেই চাঁদের আলোয় পথ চিনে চিনে গভীর জঙ্গল ভেদ করে ওদের এগোতে হচ্ছিল। হঠাৎ রাস্তার ধারের ঝোপের আড়াল থেকে ইয়া কেঁদো এক বাঘ বিকট গর্জন করতে করতে একেবারে ওর সামনে এসে পড়েছে। ওর ঘাড়ের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে গিয়েই হঠাৎ থমকে বাঘটা থেমে গেছে। তারপর একলাফে আবার ঝোপের আড়ালে।

কিছুক্ষণ কোন সাড়া শব্দ নেই। তারপর ঝোপের ভেতর থেকে এক অদ্ভুত স্বর শোনা যায়ঃ 'কী সর্বনাশ! আর একটু হলেই হয়েছিল।'

ইউয়ান চান খুবই বিচলিত, কিন্তু তা সত্ত্বেও গলার স্বরটা ও চিনতে পারেঃ 'নিশ্চয় আমার মিত্র লি চেঙের গলা, তাই নয় কি?' ও বললে।

ইউয়ান চান আর লি চেঙ একই বছরে কলেজের শেষ পরীক্ষা দিয়েছিল, রাজধানীতে বহু বছর ধরে ওরা বন্ধু ছিল। লি চেঙের মত একগুঁয়ে রুক্ষ মানুষকে সহ্য করা সম্ভব হত কেবল ইউয়ান চানের মত মৃদু স্বভাবের মানুষের পক্ষেই।

ঝোপের ভেতর থেকে বেশ কিছুক্ষণ কোন সাড়া শব্দ পাওয়া যায় না। তারপরে খসখসে গলায় একটা উত্তর শোনা যায়, 'হ্যাঁ, আমি সত্যি সত্যিই কুয়ো শহরের লি চেঙ। যাকে তুমি এক কালে চিনতে।'

ভয় ডর ভুলে ইউয়ান চান ঘোড়া থেকে নেমে সোজা চলে যায় ঝোপের

ধারে, বলে, 'বেরিয়ে এসো আমার পুরানো বন্ধু, এসো খানিকক্ষণ গল্পগাছা করা যাক।'

'হায়রে, আমি যে বিচ্ছিরিভাবে বদলে গেছি', সেই গলার স্বরটা উত্তর দিল 'আমার এখনকার চেহারা তোমাকে দেখাতে আমি পারবো না, আমার ভারি লজ্জা করবে। আমি যে জানি আমার দিকে একবার তাকাতে তোমার ভয় করবে, ঘেন্নায় তোমার গা ঘিন ঘিন করবে। অথচ দেখ এই বিচিত্র পরিস্থিতিতে কতকাল পরে আবার আমরা ঘনিষ্ঠ হয়েছি। তাই মিনতি করছি, চলে যেও না, মুখোমুখি দেখা নাইবা হল, কথাবার্তা চলুক।'

পরবর্তীকালে এই নিয়ে চিন্তা করার সময় ইউয়ান চানের মনে হয়েছিল সমস্ত ব্যাপারটা অপ্রাকৃত, কিন্তু সে সময়ে সব কিছু স্বাভাবিক মনে হয়েছিল ঠিক যেমন স্বপ্নের মধ্যে কত কিছু অসম্ভব ব্যাপার আমরা বিনা সন্দেহে মেনে নিই। দেহরক্ষীদের অপেক্ষা করতে বলে ইউয়ান চান ঝোপের একধারে সাহস করে বসে পড়লো, দৃষ্টির আড়ালে থাকা বন্ধুর সঙ্গে গল্প করতে লেগে গেল।

প্রথমে রাজধানীর মুখ্য সংবাদগুলো বলে গেল, আগেকার সহকর্মীদের এখনকারের কেচ্ছাগুলো শোনালো, নিজের কর্মজীবনের দীপ্তিমান সাফল্যের ঘটনাগুলো একটানা মিনমিনে গলায় আউড়ে গেল। প্রমোশনের কথা বলতে গিয়ে নিজেকেই তারিফ করলো। কথা শেষ করে চুপ করতে হয়—মনে মনে বেশ অস্বস্তি বোধ করতে থাকে। শেষমেষ ইউয়ান চান মুখ ফুটে বলতে পারে, 'তা তোমার কী হল, বলো দেখি?'

ঝোপের ওধার থেকে লি চিঙের গলায় যে কাহিনীটা বিবৃত হল সেটা এই রকমের ঃ

'বছর খানেক আগে একদিন কী যেন একটা মামুলি কাজে আমাকে দক্ষিণ দিকে পাঠানো হয়েছিল। পথে জু নদীর ধারে আমাকে রাত কাটাতে হয়। সকাল সকাল শুয়ে পড়ি, শোয়া মাত্র গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন হই। কিন্তু অল্পকালের মধ্যেই কী জানি কেন ঘুমটা ভেঙে গেল—কে যেন আমার নাম

ধরে বাইরে ডাকছিল। উঠে পড়লাম, জানালা খুলে বাইরে তাকালাম। অন্ধকারের ভেতর অপরিচিত স্বরটা ডাকছিল, মনের ভেতর থেকে কী।যেন অপ্রতিরোধ্য দোলা ঠেলে ঠেলে উঠছিল, আমাকে বাধ্য করছিল তার কথা মত চলতে।

দ্বিধা না করে আমি জানালা দিয়ে লাফিয়ে বাইরে নেমে পড়লাম—রাতের অন্ধকারের মধ্যে দিগ্বিদিক জ্ঞান শূন্য হয়ে মোহগ্রস্তের মত ছুটে চললাম। দেখতে না দেখতে কোন একটা পথ ধরে জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে গেছি। বিস্মিত হয়ে লক্ষ করলাম ছুটছি তো হাত দুটোও মাটিতে রেখে। এইভাবে ছুটে দেখছি ছোটার বেগও বেশ বেড়ে গেছে। ছুটতে ছুটতে গায়ে আমার শক্তি যেন বেড়ে যাচ্ছিল। গাছের গুঁড়ি, বড়ো বড়ো পাথর অনায়াসে ডিঙিয়ে যাচ্ছি। নজরে পড়ল বড় বড় চুলে ভরে গেছে আমার আঙ্গুলগুলো, আমার হাত, আমার কাঁধ, আমার সারা দেহ। সেই গলার স্বরের কথা ততক্ষণে ভুলে গেছি—তবুও আমি দৌড়চ্ছি—যেন দৌড়বার জন্যেই দৌড়ানো।

ভোর নাগাত একটা পাহাড়ী ঝরণার ধারে দাঁড়িয়ে স্বচ্ছ জলের দিকে তাকালাম। এক লহমায় আমি টের পেয়ে গেলাম যে আমি এক প্রমাণ মাপের বাঘে পরিবর্তিত হয়ে গেছি। বিস্ময়ের প্রথম ধাক্কাটা কেটে গেলে মনটা স্থির হয়। স্বপ্ন দেখছি বলে মনে মনে কিছুটা আশ্বস্ত হই। কতবার তো স্বপ্নে দেখেছি বিশেষ করে দুঃস্বপ্ন দেখতে দেখতে কতবার মনে মনে জেনেছি যে স্বপ্ন দেখছি। কিন্তু সময় পেরিয়ে যায়, বেলা বাড়ে, ভোরের অন্ধকার কেটে গিয়ে পূর্ণ দিবালোক এসে পড়ে। শেষ পর্যন্ত মানতেই হয় স্বপ্ন নয়, জেগেই আছি। এই প্রথম মনে ভয় ধরে, ভয়ে আমি আকুল হই। সবচেয়ে বিভীষিকাময় হল সেই চেতনা, যে জীবন যাত্রার স্বাভাবিক নিয়ম কানুনগুলো ভেঙে গেছে। এখন থেকে যা হোক কিছু ঘটতে পারে হোক না তারা যতই কেন ভয়ের ব্যাপার।

বড়ো একটা পাথরের আড়ালে ঘন ঘাসের মধ্যে ঘাপটি মেরে বসে বসে ভাবতে থাকি, যতটা সম্ভব স্বচ্ছভাবে চিন্তা করতে থাকি। কেন এমন হলো?

নিজেকে শুধাই, কিন্তু কোন উত্তর পাই না। পাথরের ধারে বসে বসে এই চিন্তাটা মনে এল যে যখন যা ঘটে তা কেন ঘটছে সেটা সঠিকভাবে কেউই জানতে পারে না। সব মানুষই কি নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে না এমন সব বলের দ্বারা যেগুলিকে তারা কখনোই সঠিক বুঝতে পারেনি? এই চরম অজ্ঞেয়তার বোধই হল প্রকৃত জ্ঞান আর নিজের ভাগ্যের সঙ্গে নিরন্তর লড়াই করতে না যাওয়াই শ্রেয়—যেমন লড়াই আমি করতে গিয়েছিলাম। এখন দেরি হয়ে গেছে। মানুষ হিসেবে আমার জীবনটা ছিল শুধু সংগ্রাম আর বিদ্রোহ। জ্ঞান যখন এল তখন সে জ্ঞান আর কাজে লাগাবার উপায় নেই। নিজের বাঘের আকৃতিটার দিকে তাকিয়ে দেখি আর ভাবি এর চেয়ে কেন মরে গেলাম না।

ঠিক সেই সময় একটা খরগোস ছুটে পালাচ্ছিল, যেখানে বসেছিলাম তার কয়েক গজ দূর দিয়ে। মুহূর্তের মধ্যে মনুষ্যত্ব কোথায় উড়ে গেল। আবার যখন মানবীয় ভাবনা মনে আসে তখন দেখলাম আমার মুখে রক্তের দাগ, শাদা থোকা থোকা লোম সেই রক্তের গায়ে লেগে রয়েছে। সেই আমার প্রথম অভিজ্ঞতা, নিজের ব্যাঘ্রত্ব সম্বন্ধে। সেদিন থেকে কত যে নিষ্ঠুরতা, কত যে বীভৎসতা আমি করে এসেছি বলে শেষ করা যাবে না।

পরদিন মাত্র কয়েকটা ঘণ্টার জন্যে মানব সত্তা আমার মধ্যে ফিরে আসে। সেই সময় আমি কথা বলতে পারি যেমন এখন তোমার সঙ্গে বলছি—খুব জটিল সব চিন্তা নিয়ে স্পষ্টভাবে মাথা খাটাতে পারি। হ্যাঁ, তখন আমি মনে মনে শ্রেষ্ঠ কাব্য থেকে আবৃত্তি করতে পারি। ছত্রের পর ছত্র। তখনই আবার স্মরণে আসে বাঘ হিসেবে কত কী নিষ্ঠুরতার কাজ করে এসেছি। কানে ভেসে আসে আমার দ্বারা আক্রান্ত জানোয়ারের মর্মান্তিক চিৎকার। তখন আমার নিজের পাশব প্রকৃতিটার জন্যে লজ্জা, ভয় আর রাগে অভিভূত হই।

কিন্তু সপ্তাহের পর সপ্তাহ যত কাটছে আমার মনের মানব ধর্মীয় স্বচ্ছতার কালগুলো কমে আসছে। কিছুদিন আগে পর্যন্ত মনে মনে ভাবতাম এটা কেমন করে ঘটে গেল যে আমি একটা বাঘ হয়ে গেলাম। আজকাল যে

চিন্তা আমার মনে প্রায়ই আসছে সেটা হল, মানুষ হয়েছিলাম কি করে ? এটা একটা সাংঘাতিক দুর্লক্ষণ, নয় কি ? অল্পকালের মধ্যেই আমার অতীতের সব স্মৃতি লোপ পেয়ে যাবে। যেটুকু মানব সত্তা এখনো আছে সেটুকুও মিলিয়ে যাবে, একটা প্রাচীন প্রাসাদ বালি আর মাটির নীচে সম্পূর্ণ ঢাকা পড়ে যাওয়ার মত। তখন আমি একটা বর্বর জানোয়ার ছাড়া আর কিছুই থাকবো না, যে সব জানোয়ার বনের মধ্যে শিকারকে তাড়া করে ফেরে, যারা তোমার হাত পা একটা একটা করে ছিঁড়ে গিলে ফ্যালে। বিন্দুমাত্র অনুশোচনা না করে...'

ওর গলার স্বরটা মিলিয়ে যায়। খানিক সময় ধরে ইউয়ান চান শুনতে পায় ঘন ঘন ভারী নিশ্বাস ওঠাপড়ার শব্দ। তারপর আবার সেই গলার স্বর শোনা যায়, এখন সেই স্বর যেন আরো ক্লিষ্ট।

'আজকাল একটা চিন্তা প্রায়ই মনে আসে মৌলিক চিন্তা নয় মোটেই, কিন্তু তবুও এর আগে কখনো এমন করে ব্যাপারটা বুঝিনি। আচ্ছা আমরা সবাই মানে মানুষ আর জন্তু জানোয়ার সকলেই—এক সময় অন্য কিছু ছিলাম না কি ? বাচ্চা থাকাকালে কখনো কখনো আমাদের আগেকার অস্তিত্বের কথা আবছাভাবে মনে থাকে, কিন্তু তারপর আমাদের বর্তমান চেহারায় যতই আমরা অভ্যস্ত হয়ে যাই ততই আমরা সেই মায়াতেই আচ্ছন্ন হয়ে পড়ি যে চিরটা কাল বুঝি আমরা এই ভাবেই রয়েছি।

তা সে যাই হোক এই সব বিমূর্ত চিন্তা ক্রমশ আমার মন থেকে দূরে চলে যাবে। একপক্ষে ভালই হবে যখন আমার মানবীয় সত্তাটা নিশ্চিহ্ন হবে, হয়ত আমি খুশিই হবো। কিন্তু আমার মনুষ্যত্ব চিরকালের জন্যে ঘুচে যাবে এই অবস্থাটাকেই আমি সব চেয়ে ভয় করি। একটা বর্বর জানোয়ার হয়ে যাব আগেকার অস্তিত্বের কোন স্মৃতিই নেই ভাবতেই আমার বর্ণনাতীত কষ্ট হয়। কিন্তু সেটাই আমার বিধিলিপি। হায় রে, এখন আর সেই পরিণতি থেকে মুক্তি নেই...'

আবার ওর গলার স্বর মিলিয়ে যায়। কিছুক্ষণের জন্যে ঝোপটা নিস্তব্ধ

হয়ে যায়। ইউয়ান চান আর ওর পেয়াদারা শ্বাসরুদ্ধ বিস্ময়ে হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, এই অবিশ্বাস্য বর্ণনা শুনে তারা ভীত ত্রস্ত। তারপর আবার সেই স্বর শোনা যায়।

'মানুষের রাজত্ব চিরকালের জন্যে ছেড়ে যাবার আগে তোমার কাছে একটা অনুরোধ করবো।' 'বলো', ইউয়ান চান বললে, 'তোমার অনুরোধ রক্ষা করা হবে।'

'অনুরোধটা হল এইটুকু। আমার আগেকার দিনগুলিতে আমার মনের বাসনা ছিল বড় কবি হিসেবে একদিন স্বীকৃতি পাবো—তা সেই বাসনা পূর্ণ হবার আগেই আমি তো এই অবস্থায় এসে পড়লাম। কত কবিতা লিখেছিলাম কিন্তু তাদের মধ্যে একটাও বোধহয় এখন আর পাওয়া যায় না। মানুষের পরিচিতি থেকে তারা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে,বাতাসের তাড়নায় ধোঁয়া উড়ে যাবার মত। আমার এই কাব্যকলার যেটুকু অবশেষ এখনো আছে তারা হল গোটা বারো কবিতা যেগুলো আমি মুখস্ত করে রেখেছিলাম। তোমায় মিনতি করছি,সেগুলো লিখে রাখো তারা যেন তাদের লেখকের মত বিস্মৃতির অতলে ডুবে না যায়।

'তাই বলে এমন মনে কোরো না বন্ধু, যে এই কয়েকটা কবিতার সুবাদে আমি বড় কবি বলে খ্যাতি পাবার আশা রাখছি। আমার শুধু এটুকুই দাশ্চিন্তা যে পৃথিবী অন্তত সেই সব কবিতার দু একটাকে ভবিষ্যং কালের জন্যে রেখে দিক যাদের জন্যে আমার বিত্ত, বৈভব, খ্যাতি, প্রতিপত্তি শেষ পর্যন্ত আমার মানসিক ভারসাম্য পর্যন্ত আমি জলাঞ্জলি দিয়েছিলাম।'

ইউয়ান চান ওর দেহরক্ষীদের দিয়ে একটা তুলি আনিয়ে নিয়ে ঝোপের ধারে বসে বসে শব্দগুলো লিখে নিল। স্পষ্ট গলায় লিচেঙ গোটা ত্রিশ কবিতা আবৃত্তি করে গেল। কবিতাগুলি সৌষ্ঠবে মনোরম, ভাবনার দিক দিয়ে চমৎকার। কিন্তু শুনতে শুনতে ইউয়ান চান এর মনে সেই করুণ সত্য উদ্ঘাটিত হল যে লি চেঙ এর বিদ্যা আর পটুতা থাকলে কী হয়, প্রতিভার সেই দীপ্তি ছিল না যার স্পর্শে কবিতা প্রাণ পেয়ে থাকে।

কবিতা আবৃত্তি করে লি চেঙ কিছুক্ষণ চুপচাপ। তারপর তার কর্কশ আত্ম-সমালোচনা সম্পৃক্ত স্বর আবার শোনা যায়, যে স্বর তাদের ছাত্রাবস্থার কাল থেকে ইউয়ান চান শুনে এসেছে।

'শুনলে অবাস্তব মনে হতে পারে, কিন্তু রাত্রে কত সময় আমার গুহার মধ্যে শুয়ে শুয়ে আমি স্বপ্ন দেখেছি আমার কবিতার সংকলন, চমৎকার বাঁধাই, রাজধানীতে পণ্ডিতদের ডেস্ক-এ রাখা আছে। বইখানা সসম্ভ্রমে তুলে নিয়ে তাঁদের মধ্যে কোন একজন পড়তে শুরু করলেন। কী বোকামি! তোমার হাসি পাচ্ছে, হাসো ভাই, হেসে নাও—সেই নির্বোধের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে হাসো যে কবি হতে চেয়েছিল আর তার বদলে বাঘ হয়েছে।'

বন্ধুর তিক্ত কণ্ঠস্বর শুনতে শুনতে ইউয়ান চান-এর আদপেই হাসি আসেনি। ওর মনে পড়ছিল অতীতে কতবার ও লি চেঙের মুখে ওর নিজের সম্বন্ধে উঁচু ধারণা আর সেই তুলনায় হীন অবস্থা নিয়ে খেদোক্তি শুনেছে।

হ্যাঁ, এখন আমি হাসির পাত্র', লি চেঙ বলে চলে, কথাগুলো যেন থুতুর মত ও ছিটিয়ে দিচ্ছিল। 'আর এই যে আমার শেষ কবিতা যা দিয়ে তোমরা আমাকে মনে রাখবে। ঝোঁকের মাথায় এখনই রচনা করে ফেললাম—আমার মত হতভাগ্য নির্বোধের সম্বন্ধে লেখা।'

ইউয়ান চান, তার পার্শ্বচরকে ইঙ্গিত করলো লিখে নেবার জন্যে। লি চেঙ আবৃত্তি করে গেল:

দুর্ভাগ্যের উপর দুর্ভাগ্য
সইতে সইতে মনটা গেল মরে
প্রবল রোগে ভুগতে ভুগতে
পরিণাম এই বিকৃত আকারে
এখন আমার অন্ধ গুহায় অবস্থিতি
তোমরা চলেছ স্বর্ণখচিত রথে
কাল রাতে ওই পাহাড় চূড়ায় দাঁড়িয়ে

হয়েছিলেম চাঁদের মুখোমুখি
পাহাড়ে পাহাড়ে উঠেছিল প্রতিধ্বনি
সে ধ্বনিতে ছিল না ভয়াল বাঘের গর্জন
ছিল শুধু তাতে করুণ বিলাপ খেদ।

ততক্ষণে চাঁদের রং পাংশু হয়ে এসেছে, ঘাসের ওপরে শিশির জমেছে, ঠান্ডা বাতাস জানিয়ে দিচ্ছে ভোর হয়ে আসছে। ইউয়ান চান আর ওর অনুচরদের মন থেকে লি চেঙের পরিবর্তনের দরুণ ভয় কেটে গেছে। ব্যাঘ্র কবির সম্বন্ধে ভয়ের বদলে এখন করুণা ওদের মনে আসছিল।

'কী দুঃখের ভাগ্য!' ওরা গুণগুণ করে বলছিল, 'এত জ্ঞান, এত ক্ষমতা শেষে এই পরিণাম!' তখন আবার লি চেঙের গলার স্বর শোনা যায়।

'আগে বলেছি কেন আমার এই পরিণতি হল তার কারণ নিয়ে আমি বিশেষ মাথা ঘামাইনি। গত বছর খানেক ধরে আমার মনে হয় আসল সত্যের এক ঝলক যেন আমি দেখতে পেয়েছি।

'মানুষ থাকা কালে তোমার নিশ্চয় মনে আছে, আমি তো আমার দেশের শহরে ফিরে গেলাম। সবাই ভাবল আমার এই কাজটা উদ্ধত, আত্মম্ভরিতা। কেউ বুঝল না যে আসলে আমার এই আচরণের অনেকখানিই আমার আত্ম-প্রতিষ্ঠার অভাব থেকেই উদ্ভুত হয়েছিল। তোমার কাছে গোপন করব না এই বলে যে আমাদের ছোট শহরের খ্যাতিমান প্রতিভা হিসেবে আমি অহঙ্কার থেকে মুক্ত ছিলাম। কিন্তু আমার এই অহঙ্কার ছিল ভয়-ভীত অহঙ্কার, ভীরুর অহঙ্কার। কবি হব বলে সংকল্প নিলাম, তবুও কোন বড় কবির পায়ের তলায় বসে তালিম নিলাম না, সহযোগী লেখকদের সঙ্গে মিশলাম না—কেন না ভেতরে ভেতরে আমি ভয় পেতাম যে অন্য কবিদের সংস্পর্শে এলে পরেই আমার কবি প্রতিভা রূপ মণিখানি যে আসলে মণি নয়, মণি গাঁথবার আঠা, সেটা প্রকাশ হয়ে যাবে।

'আবার একই সঙ্গে আমার মনে হত, সত্য সত্যই মণির আমি অধিকারী, তাই সেই সব নীচুস্তরের মানুষজনের সঙ্গে মিশতেও আমার ঘৃণা বোধ হত,


1961

সাহিত্য নিয়ে যাদের কাজ কারবার নয়। তাই বাইরের জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নিজের পরিবারের মধ্যেই নিভৃত জীবন যাপন করতে লাগলাম। সাধারণ লোকদের হীন দৃষ্টিতে দেখতাম। অর্থকষ্ট আবার আমাকে ঘৃণা করতে শেখায় তাদেরকে, অর্থ উপার্জনই যাদের জীবনের লক্ষ্য। কিন্তু সর্বদাই একটা ভয় আমাকে পীড়িত করছিল যে আসলে আমার মধ্যে কবি প্রতিভা মোটেই নেই। অহঙ্কার আর নিজের প্রতি অনাস্থা আমার মধ্যে বেড়ে চলছিল। শেষ পর্যন্ত আমার গোটা অস্তিত্বটাই যেন গড়ে উঠল তাদের দিয়ে।

'বলা হয়ে থাকে আমরা সবাই প্রকৃতিতে নাকি জংলী পশু আর মানুষ হিসেবে আমাদের কর্তব্য হল প্রশিক্ষকের, ভেতরের জানোয়ারগুলোকে প্রশিক্ষিত করে তোলা এমন কি তাদের দিয়ে এমন সব কাজ করিয়ে নেওয়া যেগুলি সেই সব পশু প্রকৃতির থেকে একেবারেই ভিন্ন ধরনের। আমার এই ভীরু অহঙ্কারটা ছিল এক জংলী পশুর মত যাকে আমার বুদ্ধি আমার সংস্কার দিয়ে শাসন করতে আমি পারিনি। এই অহঙ্কারের কারণেই আমি বড় কবি হতে পারিনি। আমি বেশ ভাল ভাবেই জানি যে কত লোক আমার থেকে কত কম প্রতিভা নিয়ে কবি খ্যাতি পেয়ে গেল। বিনম্রভাবে অন্যের রচনার অধ্যয়ন আর একনিষ্ঠ পরিশ্রমই ছিল তাদের ব্রত। আর আমার এই অহঙ্কারের দরুণ আমার পরিবার অর্থকষ্টে পড়ল, আমি পেলাম নিরন্তর যন্ত্রণা। সেই প্রবল অহঙ্কার শেষ পর্যন্ত আমাকে জংলী পশুতে পরিণত করে দিল—আকৃতিতে আর প্রকৃতিতেও।

'হায় রে, অনুশোচনায় ফল হবার সময় পেরিয়ে গেছে। মানুষ হিসেবে আমার দিন ফুরিয়েছে। আমার মনুষ্যত্বের শেষ চিহ্নটুকু আস্তে আস্তে মিলিয়ে যাবে। হায়রে কী অপচয়! কী করুণ অবস্থা! কতবার রাত্রে আমি এই পাহাড়ের ওপর দাঁড়িয়ে ডাক ছেড়ে কেঁদেছি নীচের উপত্যকার জনপদের দিকে লক্ষ্য করে। আমার মর্মবেদনার কথা কেউ কি শুনে বুঝবে না। ছোট ছোট জানোয়ারেরা আমার গর্জন শুনে নিজের নিজের বাসায় ভয়ে মাটি কামড়ে শুয়ে পড়ে। এই পাহাড়, এই গাছপালা, এই চাঁদ, এই শিশির এরা আমার

কান্না শুনে ভাবে বাঘের গর্জন কি ভয়ঙ্কর। বাতাসে লাফ দিয়ে উঠে, মাটিতে লুটিয়ে পড়ে রাতের পর রাত আমি চীৎকার করে কেঁদেছি। কিন্তু না, কেউ না, আমার ভেতরটাতে যে হতাশা আমাকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে খাক করছে সেটা কেউ একটুও বুঝতে পারেনি। আমার মানুষ জীবনের দিনগুলিতেও যেমন ছিল ঠিক তেমনিই··· ।'

অন্ধকার প্রায় ঘুচে এসেছিল। দূর থেকে কোন শিকারীর শিঙার ধ্বনি শোনা যায়। 'বিদায় নেবার সময় এসেছে,' লি চেঙ বললে। 'সেই ভৌতিক লগ্ন আগত প্রায় যখন আবার আমি দেহে এবং মনে বাঘ হয়ে যাবো। তার আগে একটা অনুরোধ করব। উত্তরে যখন ফিরে যাবে কুয়োলাচ শহরে গিয়ে আমার পরিবারের সঙ্গে দেখা কোরো। এই দেখা হওয়ার কথাটা বলবার দরকার নেই। কথা প্রসঙ্গে বরং তাদের বলে দিও যে নানা জায়গায় ঘুরতে ঘুরতে কোথায় যেন শুনেছ যে আমার মৃত্যু হয়েছে। আর তারা যদি অর্থকষ্টে পড়ে থাকে তাহলে তাদের একটু দয়া কোরো।

লি চেঙের কথা শেষ হবার পরে ঝোপের ভেতর থেকে যেন কান্নার আওয়াজ শোনা গেল। ইউয়ান চানের মনে প্রবলভাবে আলোড়ন জেগে উঠেছে। ও কথা দিল বন্ধুর অনুরোধগুলি অক্ষরে অক্ষরে পালন করবে। তারপর আবার লি চেঙের গলা শোনা যায়—হঠাৎ করে সেই স্বরে আবার ফিরে এসেছে আগেকার কর্কশ, আত্মধিক্কারের সুর।

'নিঃসন্দেহে, তুমি ভাবছ যে দ্বিতীয় অনুরোধটাই আমার প্রথমে করা উচিত ছিল। ঠিকই ভাবছ আমি যে সেই চরিত্রেরই মানুষ ছিলাম যার কাছে তার দুর্বল কবিতাগুলো কোন কোন লোকের চোখে পড়ল সেটাই ছিল বড়ো—উপবাসী স্ত্রী-পুত্রের মুখে অন্ন জোটানো যায় কিনা সে চেষ্টার থেকে। তাই তো আমি জংলী পশুতে পরিণত হলাম। আর একটা কথা। ফেরার পথে অন্য কোন রাস্তা দিয়ে তোমরা যেও কিন্তু। ততদিনে হয়ত আমি আর পুরানো বন্ধুদের চিনতে পারার ক্ষমতাও হারিয়ে ফেলব। আর কথাটা এখন চিন্তা করতে ঘৃণা হচ্ছে, তোমাকে হয়তো টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে

খেয়ে ফেলবো। আর তোমার মনে যদি আমাদের পরিচিতিটা আর একবার ঝালিয়ে নেওয়ার বাসনা থাকে তাহলে চলে যাওয়ার সময় যখন ঐ পাহাড়টার মাথায় উঠবে তখন একবার পেছন দিকে তাকিয়ে দেখো। তখন তুমি শেষবারের মত আমাকে দেখতে পাবে, আর একবার দেখলে দ্বিতীয়বার দেখবার প্রবৃত্তি আর তোমার হবে না।'

'তাহলে প্রিয় বন্ধু এবার বিদায় দাও,' ঝোপের দিকে তাকিয়ে আন্তরিক সৌজন্যের সঙ্গে বললে ইউয়ান চান। গম্ভীর, বিষাদময় ভঙ্গিতে ও ঘোড়ার পিঠে চড়ল, আবার রওনা দিল নিজের পথে, অনুচরেরা চলল সাথে সাথে। ঝোপের ভিতর থেকে পেছন পেছন কর্কশ গলায় ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্নার আওয়াজ শোনা যাচ্ছিল।

দলটা যখন পাহাড়ের মাথায় পৌঁছে গেছে, ইউয়েন চান একবার সেই গাছপালায় ঘেরা অঞ্চলটার দিকে ফিরে তাকালো যেটা ছেড়ে এসেছে কিছু আগে। হঠাৎ ঘন ঘাসের ঝোপের আড়াল থেকে পথের ওপর লাফিয়ে এল এক মস্ত বড় বাঘ। কিছুক্ষণ সে নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল পথের ওপর— তারপর নিষ্প্রভ শাদা চাঁদের দিকে তার দৃষ্টি মেলে দিল, আর তিনবার করুণ সুরে ডেকে উঠল। তৃতীয় আওয়াজটার প্রতিধ্বনি যখন মিলিয়ে যাচ্ছিল উপত্যকার ভেতরে, বাঘটা তখন আবার ঝোপের মধ্যে লাফ দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল।

পরিচিতি : নাকাজিমাতন

লেখক 1942 সালে মাত্র তেত্রিশ বছর বয়সে মারা যান। চীনা ভাষার পাণ্ডিত্যের খ্যাতি সম্পন্ন এক পরিবারে নাকাজিমার জন্ম। নিজেও শাস্ত্রীয় চীনা ভাষায় সুপণ্ডিত। ইংরেজি, ফ্রেঞ্চ ও জার্মান সাহিত্যের সঙ্গে তাঁর সরাসরি পরিচয় ছিল।

সাহিত্য জীবন সংক্ষিপ্ত হলে কি হবে, ছোট গল্পের জন্য নাকাজিমার

খ্যাতি কিন্তু কম নয়। বিস্তৃত বহুমুখী জ্ঞান ও স্বকীয় স্টাইলে তাঁর রচনার রূপকল্প ফ্রানজ কাফকার কথা মনে করিয়ে দেয়—যেমন আলোচ্য গল্পটিতে মনে হতে পারে।

ব্যাঘ্র কবি প্রকাশিত হয় 1942 সালে। ওই বছরই লেখক মারা যান। ক্লাসিকাল চীনা রীতিতে লেখা—লি চেঙ-এর কবিতাটিও ক্লাসিকাল চীনা রীতি অনুসরণ করেছে। সাতটি করে শব্দ (বা চীনা অক্ষর) নিয়ে একেকটি পংক্তি, প্রতি পংক্তির শেষের শব্দটির যে পদ পরের পংক্তির প্রথম শব্দটির সংগতি থাকবে সেই পদের সঙ্গে।

সন্ন্যাসী ও তার প্রেম : মিশিমা ইয়ুকিও

এশিন লিখিত "মুক্তির উপায়" গ্রন্থে নাকি বর্ণিত আছে যে, পবিত্রধামের আনন্দধারার সঙ্গে তুলনায় দশটি ইন্দ্রিয়জ সুখ মহাসমুদ্রের একবিন্দু জলের সমান। সেই দেশের ভূমি পান্না দিয়ে তৈরী—আর সেই ভূমির ওপর বিছিয়ে থাকা রাস্তাগুলির দুই ধারে সোনার কাছি দিয়ে সীমানা দেওয়া। অপার বিস্তৃত ভূমি সর্বত্র নিখুঁত ভাবে সমতল। প্রতিটি পবিত্র হর্ম্যের মধ্যে লক্ষাধিক দালান আর স্তম্ভ। সোনা, রুপো আর লাপিস লাজুলি, স্ফটিক প্রবাল আর মুক্তো দিয়ে তৈরি সেই দালান আর স্তম্ভগুলি। প্রতিটি মণ্ড ঘেরা আছে অপূর্ব বস্ত্রখন্ড দিয়ে। এইসব দালান আর স্তম্ভের অভ্যন্তরে অসংখ্য দেবদূতদের কণ্ঠে নিরন্তর গীত হয়ে চলেছে স্তবস্তুতি—তথাগত বুদ্ধের মহিমা কীর্তিত হচ্ছে। দালান আর স্তম্ভ আর চৈত্যগুলিকে ঘিরে থাকা উদ্যানে আছে অনেকগুলি সুবর্ণের আর পান্নার সরোবর। সেই সরোবরে ভক্তেরা ইচ্ছে হলে স্নান করতে পারে। সুবর্ণের সরোবরের কিনারায় রুপোলি বালি, পান্নার সরোবরের বালি স্ফটিকের। সরোবরগুলিকে ঢেকে রেখেছে পদ্মল তার দাম। তাদের মধ্য থেকে বিচ্ছুরিত হয় নানান রঙের আলো, আর যখন বাতাস জলের ওপর দিয়ে বয়ে যায় তখন দিগ্বিদিকে ছড়িয়ে পড়ে অপূর্ব বর্ণশোভা। দিবারাত্র বাতাস মুখর হয় কত না পাখির কলগীতে—সারস, মরাল চক্রবাক, ময়ূর, চন্দনা আর কলাবিঙ্ক। এই কলাবিঙ্কদের মুখগুলি সুন্দরী মানবকন্যার মুখ। এরা ছাড়াও আরো কত শত রত্নখচিত পাখির গলায় সুললিত সুরে মন্দ্রিত হচ্ছে বুদ্ধের মহিমার প্রকাশ। (সেই সুরগুলি যতই সুমিষ্ট হোক না কেন—এত পাখির জটলা থেকে কোলাহলও উঠত নিশ্চয় খুব বেশি।)

সরোবরের কিনারা বেড় দিয়ে, নদীর তীর বরাবর চলে গেছে মণি মাণিক্যের ফুলের শোভায় সাজানো গাছের সারি। সে সব গাছের কান্ড

সোনার, শাখাগুলি রুপোর আর তাতে ফুটে আছে মুক্তোর ফুল। আর, তাদের অপূর্ব শোভা জলের ওপর নিত্য প্রতিবিম্বিত হয়। বাতাসে টাঙানো আছে অসংখ্য রত্ন-খচিত সুতো আর সেই সুতো থেকে ঝুলছে লক্ষ লক্ষ মণিমুক্তো খচিত ছোট ছোট ঘণ্টা। সেই ঘণ্টা থেকে প্রতিনিয়ত ধ্বনিত হচ্ছে বুদ্ধের সর্বোত্তম বিধানাবলী। অদ্ভুত সব বাদ্যযন্ত্র, তাদের বাজাবার জন্যে হাত দিয়ে ছুঁতে লাগে না—এই বাদ্যধ্বনি নির্মল আকাশের বহুদূর পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত হয়ে যায়।

কিছু খেতে ইচ্ছে হল তো অমনি চোখের সামনে হাজির হবে সপ্ত-রত্ন-বিভূষিত এক ঝকঝকে টেবিল যার উপরে রাখা আছে সপ্ত মাণিক্য খচিত থালায় উপচে পড়া উৎকৃষ্ট ভোজ্য সামগ্রী। হাতে করে মুখে তোলবার দরকার নেই। তাদের লোভনীয় বর্ণশোভা ভাল করে দেখতে দেখতে আর তাদের সুআঘ্রাণ নিতে নিতেই পেট বেশ পরিতৃপ্তির সঙ্গে পূর্ণ হয়ে যাবে। দেহ পুষ্ট হয়ে উঠবে। শরীর মন ক্লেদশূন্য শুচি থাকবে। ভোজন পর্ব সমাধা হলে পরে—সত্যি সত্যি না খেলেও—পাত্রসহ টেবিল অন্তর্হিত হয়ে যাবে।

ঠিক তেমনিধারা—পোশাক সেলাই, ধোলাই, রঙে ছোপানো, রিপুকর্ম না করেই—দেহ আপনা আপনিই সুসজ্জিত হয়ে যায়। বাতিও সেখানে নিষ্প্রয়োজন—আকাশ থেকে সর্বব্যাপী প্রভা থাকার দরুণ সর্বদাই বরাবর আলোকিত। তার ওপর, সেই পবিত্রধাম সারাবছরই মৃদুভাবে নাতিশীতোষ্ণ। তাই উত্তপ্ত বা শীতল করার ব্যবস্থারও সেখানে দরকার হয় না। বাতাসে লক্ষ সুগন্ধি মেশানো স্নিগ্ধতা—কমলের পাপড়ি সেখানে বৃষ্টির মত নিয়তই ঝরে ঝরে পড়ছে।

পরীক্ষণ ফটক-এর অধ্যায়ে নাকি লেখা আছে যে যেহেতু অদীক্ষিত দর্শকেরা পবিত্রধামের খুব বেশি ভেতরে প্রবেশ করতে পারে না তাই তাদের পক্ষে বিধেয় হল প্রথমে চিত্তের একাগ্রতার অভ্যাসের দ্বারা নিজের নিজের "বাহ্যিক কল্পনাশক্তি" কে জাগিয়ে তোলা আর, তারপর ক্রমে ক্রমে সেই শক্তিকে প্রখর করে তোলা। "কল্পনাশক্তির উজ্জীবন" থেকেই হ্রস্বপথে পাওয়া যায় পার্থিব

জীবনের দুঃখ কষ্ট থেকে অব্যাহতি—পাওয়া যায় বুদ্ধকে অপরোক্ষ করার উপায়। সমৃদ্ধ, উদ্বেল কল্পনার অধিকারী হলে পরেই আমরা আমাদের সমগ্র একাগ্রতা কেন্দ্রিত করতে পারি একটি মণিপদ্মে এবং সেখান থেকে ব্যাপ্ত হতে পারি অপার দিগন্তে।

আনুবীক্ষণিক নিরীক্ষণ আর জ্যোতির্বিদ্যা সম্মত অভিক্ষেপণ-এর সহায়তায় পদ্মকে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের ভিত্তি হিসাবে আর সত্যদর্শনের এক প্রতিভূ হিসাবে ধারণা করা যায়। তবে সর্ব প্রথম আমাদের জানতে হবে সেই পদ্মের প্রতিটি পল্লবকে। প্রতিটি পল্লবের মধ্যে আছে চুরাশি হাজার শিরা আর প্রতিটি শিরা থেকে বিচ্ছুরিত হচ্ছে চুরাশি হাজার দীপশিখা। আর একটা কথা হল এই পদ্মগুলির মধ্যে সবচেয়ে ছোটটির ব্যাস দুশ পঞ্চাশ যোজন। আর ধর্মগ্রন্থে লেখা তথ্য অনুসারে এক যোজনকে যদি ধরা যায় পঁচাত্তর মাইল তাহলে মেনে নিতে হয় যে একেকটা পদ্ম কুসুমের ব্যাস কমপক্ষে ঊনিশ হাজার মাইল।

তা এমনি একটা পদ্ম কুসুমে চুরাশি হাজার পল্লব থাকে আর প্রত্যেক পল্লবের মধ্যে থাকে দশ লক্ষ মণিমাণিক্য যাদের প্রত্যেকটা থেকে বিচ্ছুরিত হচ্ছে হাজারটি করে প্রভা। অপূর্ব গঠনের সুসজ্জিত পদ্মকোরকের ওপরে চারটি রত্ন খচিত স্তম্ভ আছে, প্রতিটি স্তম্ভ সুমেরু পর্বতের থেকে সহস্র কোটি গুণ উঁচু। বৌদ্ধ মতানুযায়ী ব্রহ্মাণ্ডের কেন্দ্রস্থলে এর অবস্থান। স্তম্ভের শীর্ষ থেকে ঝুলিয়ে রাখা আছে অপূর্ব রত্ন চাঁদোয়া, পাঁচ হাজার কোটি রত্ন দিয়ে তারা সুসজ্জিত—প্রতিটি রত্ন থেকে বিচ্ছুরিত হচ্ছে চুরাশি হাজার দীপ-শিখা—প্রতিটি দীপশিখা আবার চুরাশি হাজার সুবর্ণ রঞ্জিত রশ্মি দিয়ে গঠিত আর এই সুবর্ণ রঞ্জিত বর্ণশোভার প্রত্যেকটি আবার বিচিত্রভাবে রঞ্জিত।

এইভাবে একাগ্রচিত্তে সৃষ্টির বিষয়ে কল্পনা করাকে বলা হয় সেই পদ্মাসনের ধ্যান যার ওপর স্বামী বুদ্ধ আসীন হন। আর এই আমাদের গল্পের পশ্চাৎপটে যে ভাবগত বিশ্ব উন্মোচিত সেই বিশ্বকে কল্পনা করতে হবে এই মাপকাঠিতে।

শিগা মন্দিরের প্রধান পুরোহিত সর্বগুণান্বিত মহাপুরুষ। তাঁর ভ্রূযুগল শুভ্রবর্ণ। বার্ধক্যের দরুণ মন্দিরের একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্তে তিনি জীর্ণ শরীরটাকে লাঠি হাতে কোন রকমে টেনে নিয়ে যেতে পারতেন।

এই মহাপ্রাজ্ঞ সন্ন্যাসীর কাছে পার্থিব জগৎ একরাশ আবর্জনার তুল্য ছিল। বহু বছর সে জগৎ তিনি ছেড়ে এসেছেন। নিজের বর্তমান গুহায় চলে আসার কালে পাইনের যে চারা গাছটি রোপন করেছিলেন সেই চারা গাছ এখন বিশাল মহীরুহ। বাতাসে তার শাখা প্রশাখা হিল্লোলিত হয়ে থাকে। যে সন্ন্যাসী এত দীর্ঘকাল ধরে প্লবমান লঘু জগতের সংস্পর্শ এড়িয়ে থাকতে পেরেছেন—পরকাল সম্বন্ধে যে তিনি নিরুদ্বেগ থাকতে পারবেন একথা বলাই বাহুল্য।

ধনী, সম্ভ্রান্ত কোন ব্যক্তিকে দেখলে তাই প্রধান পুরোহিত করুণায় স্মিত হাসি হাসতেন—ভাবতেন এই মানুষগুলি কেন তাদের পার্থিব সুখের বিষয়গুলিকে অন্তসার শূন্য স্বপ্ন বলে ভাবতে পারছে না। সুন্দরী স্ত্রীলোক দেখলে তাঁর মনে কেবল সেইসব পুরুষমানুষদের জন্যে করুণার উদ্রেক হত যারা এখনো এই মায়ার জগতে বাস করছে আর ইন্দ্রিয় সুখের বিক্ষুব্ধ তরঙ্গে নাকানি চোবানি খাচ্ছে।

কোন মানুষ যে মুহূর্ত থেকে জাগতিক উদ্দেশ্যাদির দ্বারা বিচলিত হওয়া থেকে নিবৃত্ত হতে সক্ষম হয় তৎক্ষণাৎ পৃথিবী তার কাছে সম্পূর্ণ শান্ত রূপে প্রতিভাত হয়। প্রধান পুরোহিতের চোখে পৃথিবী সম্পূর্ণ নিশ্চল প্রশান্ত। যেন কাগজের ওপরে আঁকা কোন ছবি। যেন কোন ভিন-দেশের মানচিত্র। কোন ব্যক্তি যখন মনের সেই অবস্থায় উন্নীত হয়, যেখান থেকে বর্তমান জীবনের হীন লালনার প্রবৃত্তিগুলি সম্পূর্ণভাবে উৎপাটিত হয়ে গেছে—সেই মন থেকে ভয়ও সেই সঙ্গে সম্পূর্ণভাবেই বিদূরিত হয়ে যায়। তাই প্রধান পুরোহিত ভাবতেই পারতেন না নরক বলে কিছু কেন থাকবে। দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে তিনি বিশ্বাস করতেন যে বর্তমান জগৎ তাঁকে কোন ভাবেই প্রভাবিত করতে পারবে না। কিন্তু যেহেতু তিনি অহংকার

থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ছিলেন তাই তাঁর কখনোই মনে হত না তাঁর নিজের স্বদগুণাবলীই তাঁর এই স্থির বিশ্বাসের কারণ।

তাঁর নিজের দেহের কথা বলতে গেলে, একথা মানতে হবে যে মেদমাংসের বোঝা থেকে তিনি প্রায় সম্পূর্ণ রিক্ত হতে পেরেছিলেন। নিজের দেহের দিকে কখনো কখনো দৃষ্টি দিতে গিয়ে—যেমন হত হয়ত বা স্নানের সময়—তিনি উৎফুল্ল হয়ে লক্ষ করতেন বিশুষ্ক দেহচর্ম কেমন খোঁচা দিয়ে বেরিয়ে আসা হাড়গুলিকে বিপজ্জনকভাবে আবরিত করে রেখেছে। শরীর যখন এই পর্যায়ে এসে পড়েছে তখন তাঁর মনে হত, এর মোকাবিলা করতে তিনি সক্ষম হবেন, ভাবতে পারবেন এই শরীর তাঁর নয়। এমনি একটা শরীর যেন ইতিমধ্যেই পবিত্রধাম থেকে পুষ্টি আস্বাদন করবার উপযোগী হয়ে উঠেছে—জাগতিক খাদ্য পানীয় এখন আর এর দরকার নেই।

প্রতিরাত্রে স্বপ্নে তিনি বিচরণ করতেন পবিত্র ধামে। জেগে উঠে তাঁর মনে হত বর্তমান জগতে জীবনধারণের অর্থ হল বিষাদময় অলীক একটা স্বপ্নের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে থাকা।

পুষ্প শোভা অবলোকন সমারোহের ঋতুতে রাজধানী থেকে বহুলোক আসত শিগা গ্রামে। প্রধান পুরোহিতের সে কারণে বিন্দুমাত্র অসুবিধে হত না—জাগতিক কোলাহল থেকে বিচলিত হবার অবস্থা থেকে তাঁর মন অনেক উচ্চস্তরে পৌঁছে গিয়েছিল। বসন্তের এক সন্ধ্যায় লাঠিতে ভর দিয়ে প্রধান পুরোহিত চলেছিলেন সরোবরের অভিমুখে। প্রদোষের ছায়া প্রলম্বিত হয়ে পড়ন্ত বিকেলের মধ্যে প্রবিষ্ট হয়ে যাচ্ছিল। জলের উপরিতলকে বিঘ্নিত করতে ক্ষুদ্রতম একটি তরঙ্গও উঠছিল না। সরোবরের কিনারায় একান্তে দাঁড়িয়ে প্রধান পুরোহিত একটি উপাসনার অনুষ্ঠানে বৃত হলেন—অনুষ্ঠানটির নাম জলধ্যান।

ঠিক সেই সময় বলদ টানা এক রথ, নিঃসন্দেহে কোন উচ্চ পদাধিকারীর রথ, সরোবরের ধারে পুরোহিত যেখানে দাঁড়িয়েছিলেন, তারই কাছে এসে থামে। রথের মালিক রাজদরবারের এক মহিলা। রাজধানীতে কিয়োগোকু

অঞ্চলে তাঁর বাড়ি—সম্মানিত পদবীর অধিকারিনী, প্রধানা রাজনটী। এই সম্ভ্রান্তা মহিলাও এসেছিলেন শিগাগ্রামের বসন্ত কালের নিসর্গ সমারোহ দেখতে। ফেরার পথে শেষবারের মত একবার সরোবরটা দেখে নিতে গাড়ি দাঁড় করিয়েছিলেন।

নিজের অজান্তে প্রধান পুরোহিত সেই দিকে একবার তাকিয়েছিলেন আর তৎক্ষণাৎ রাজনটীর সৌন্দর্যে তিনি সম্পূর্ণ অভিভূত হলেন। তাঁর চোখের দৃষ্টি রাজনটীর দৃষ্টির সঙ্গে মিলল—পুরোহিত দৃষ্টি নামিয়ে নিলেন না। রাজনটীও মুখ ফিরিয়ে নেননি। তার কারণ এই নয় যে রাজনটীর মন এমনই উদার যে পুরুষ মানুষের অভব্য তাকিয়ে থাকা বিনা বাক্য ব্যয়ে মেনে নেবে। কিন্তু এই বৃদ্ধ সংযমী সন্ন্যাসীর তাকিয়ে থাকার উদ্দেশ্য নিশ্চয়ই সাধারণ মানুষের থেকে ভিন্ন হবে বলেই তাঁর মনে হয়েছিল।

কয়েক মুহূর্ত পরে মহিলা পর্দা নামিয়ে দিলেন। গাড়িখানা চলতে শুরু করল। শিগা চড়াই পেরিয়ে আস্তে আস্তে রাজধানীর অভিমুখের রাস্তা ধরে চলল। রাত নামল। রজত-মন্দির মার্গ ধরে গাড়িখানা শহরের দিকে এগিয়ে চলল। দূরের গাছপালার মধ্যে যতক্ষণ না গাড়িখানা একটি বিন্দু হয়ে মিলিয়ে গেল, ততক্ষণ প্রধান পুরোহিত স্থানুর মত সেখানে দাঁড়িয়ে ছিলেন।

এক পলকের মধ্যে ইহজগৎ প্রবল পরাক্রমে তার প্রতিশোধ নিল প্রধান পুরোহিতের ওপর। যে ইমারৎ তিনি ভেবেছিলেন সম্পূর্ণ নিরাপদ—চুরমার হয়ে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হল এক মুহূর্তে।

মন্দিরে ফিরে পুরোহিত বুদ্ধের প্রধান মূর্তির সামনে এসে দাঁড়ালেন। স্মরণ করলেন ইষ্ট নাম। কিন্তু অশুচি চিন্তার ধূসর ছায়া তাঁকে ঘিরে ফেলতে চায়। স্ত্রীলোকের সৌন্দর্য হল ক্ষিপ্রগামী এক প্রেত মূর্তি। মাংস দিয়ে গড়া এক ক্ষণিক প্রাকৃতিক ঘটনা। মাংস, যা কিনা অচিরেই বিনষ্ট হয়ে যাবে—সন্ন্যাসী নিজের মনকে বোঝাতে চাইলেন। কিন্তু যতই কেন মন থেকে তাড়িয়ে দিতে চেষ্টা করুন, যে অপরূপ সৌন্দর্য সরোবরের

ধারে এক মুহূর্তের মধ্যে তাঁকে বিবশ করেছিল এখন সে যেন তাঁর হৃৎপিণ্ডের ওপরে চাপ দিচ্ছিল প্রবল শক্তিতে। সেই শক্তি যেন আসছে কোন অনন্ত দূরত্ব থেকে। শারীরিক কিংবা মানসিক দিক দিয়ে প্রধান পুরোহিতের এখন আর সেই তারুণ্য নেই, যা বিশ্বাস করতে পারে যে এই নতুন অনুভূতিটা হল দেহজ একটা ফাঁদ যা তাঁকে কাবু করেছে। কোন মানুষের শরীরে এত তাড়াতাড়ি এত পরিবর্তন ঘটতে পারে না—এটা তিনি ভালই জানতেন। বরং তাঁর মনকে আচ্ছন্ন করে পরিবর্তন ঘটিয়ে দিয়েছে কোন তীব্র, তীক্ষ্ণ, সূক্ষ্ম ভাবে ক্রিয়াশীল বিষ।

প্রধান পুরোহিত এতদিন পর্যন্ত কখনো ব্রহ্মচর্য রক্ষার প্রতিজ্ঞা থেকে ভ্রষ্ট হননি। শরীরের তাগিদের বিরুদ্ধে যে যুদ্ধ তিনি যৌবনে ঘোষণা করেছিলেন সেই রণনীতিই তাঁকে শিখিয়ে ছিল স্ত্রীলোককে শুধু মাত্র কামসর্বস্বজীব বলে গণ্য করতে। একমাত্র সেই দেহই দেহ বলে গণ্য করা যায় যে দেহের অস্তিত্ব আছে কেবল মাত্র তার নিজের কল্পনায়। তাই যেহেতু দেহ তাঁর কাছে বস্তুগত ঘটনার পরিবর্তে এক বিমূর্ত আদর্শ তাই তাঁর নিজে আত্মিক শক্তির ওপর ভরসা করেছিলেন সেই দেহকে শাসনে রাখার ব্যাপারে। এই প্রয়াসে সন্ন্যাসী সফল হয়েছিলেন—সফল যে হয়েছিলেন সে বিষয়ে যারা তাঁকে জানত তাদের কারো মনে কোন সন্দেহ ছিল না।

তথাপি যে স্ত্রীলোকটি শকটের পর্দা তুলে সরোবরের দিকে দৃষ্টি মেলে দিয়েছিল সেই মুখ অতীব সুষমা মণ্ডিত, দীপ্তিময়ী। তুচ্ছ দেহগত রূপ তাকে বলা চলে না—সন্ন্যাসী ভেবে পান না কোন নামে তাঁকে আখ্যায়িত করবেন। তিনি কেবল এইটুকু চিন্তা করতে পেরেছিলেন যে সেই অনির্বচনীয় মুহূর্তটির উদ্ভব হবার কালে নিজের অন্তরের কোন গূঢ় কোণে লুকিয়ে ছিল প্রচ্ছন্ন ভাবে এমন কিছু যেটা শেষ পর্যন্ত আত্মপ্রকাশ করে ফেলল। সেটা আর কিছুই নয়, এই পরিদৃশ্যমান বস্তু জগৎ, যা এতকাল ছিল সমাহিত, যা এখন হঠাৎ অন্ধকারের ভেতর থেকে মাথা তুলেছে এবং এখন শুরু করেছে নড়া চড়া।

ঠিক যেন রাজধানীর অভিমুখে বড় রাস্তার ধারে তিনি দাঁড়িয়ে ছিলেন দৃঢ়ভাবে দুকানে হাত চাপা দিয়ে, দেখছিলেন দুটি গোশকট গড় গড় করে চলে যাচ্ছে পরস্পরকে অতিক্রম করে। হঠাৎ হাত সরিয়ে নিতেই বাইরের শব্দ প্রবল তরঙ্গের মত তাকে সবদিক থেকে ঘিরে ফেলেছে।

চলমান ঘটনা প্রবাহের উত্থান পতনের দিকে নজর রাখা, তাদের থেকে উত্থিত কোলাহলের গর্জন কানে আসার অর্থ হল বর্তমান জগতের বৃত্তে প্রবেশ করা। প্রধান পুরোহিতের মত একজন মানুষ যিনি বাহ্য জগতের সব কিছু থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়েছেন, তাঁর পক্ষে এর অর্থ হল আবার নতুন করে সেই বাহ্য জগতের সঙ্গে সম্পর্ক পাতানো।

সূত্রগুলি পাঠ করার কালেও কতবার তাঁর কানে আসছিল নিজের অন্তর থেকে হৃদয় মথিত করে উঠে আসা অনেকগুলি বেদনাময় দীর্ঘশ্বাস। হয়ত নিসর্গ প্রকৃতি তাঁর বিচলিত আত্মাকে প্রশমিত করতে পারবে মনে করে জানালার ভেতর দিয়ে গুহার বাইরে দৃষ্টি মেলে দিলেন, সন্ধ্যার আকাশের নীচে উঁচু হয়ে দাড়িয়ে থাকা দূরের পাহাড়ের দিকে। কিন্তু তার চিন্তা এই নিসর্গ চিত্রের সৌন্দর্যে কেন্দ্রিত হবার বদলে ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘের মত কোথায় ভেসে বেড়াতে লাগল। চাঁদের ওপর দৃষ্টি রাখলেন কিন্তু চিন্তা আগের মতই ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হয়ে যায়। তাই আর একবার যখন বুদ্ধের প্রধান মূর্তির সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন মনের পবিত্রতা ফিরিয়ে আনার শেষ বেপরোয়া চেষ্টায় তখন দেখলেন বুদ্ধের মুখ বদলে হয়ে গেছে সেই গাড়ির ভেতরের মহিলার মুখ। তাঁর বিশ্ব চরাচর সংকীর্ণ হয়ে এক হ্রস্ব পরিধি দেওয়া বৃত্তের মধ্যে বন্দী হয়ে গেছে। সেই বৃত্তের এক প্রাণ বিন্দুতে রয়েছেন প্রধান পুরোহিত। আর অপর প্রান্তে তাঁর চোখের সামনে রয়েছেন প্রধানা রাজনটী।

কিয়োগোকু নিবাসিনী প্রধানা রাজনটী অল্প কালের মধ্যেই সেই বৃদ্ধ পুরোহিতের কথা ভুলে গিয়েছিলেন, যাঁকে তিনি শিগা গ্রামে সরোবরের কিনারায় দাঁড়িয়ে যে তাঁর দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতে দেখেছিলেন।

কিছুকাল কেটে যাবার পরে কিন্তু তাঁর কানে এক গুজব এসে পেঁছিতে সেই ঘটনাটা আবার মনে পড়ে যায়। গ্রামের কোন লোক প্রধান পুরোহিতকে দূরে অপসৃয়মান গাড়িখানার দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতে দেখেছিল। সে আবার এই ঘটনার উল্লেখ করেছিল রাজ দরবারের কোন অধিকারীর কাছে। এই অধিকারী পুষ্প অবলোকনের উদ্দেশ্যে শিগাতে এসেছিলেন। সে আরো বলেছিল যে সেদিন থেকে প্রধান পুরোহিত নাকি বাতুলের মত আচরণ করছেন।

প্রধানা রাজনটী গুজবে কান দেবেন না স্থির করলেন। এই পুরোহিতের সাধুতা রাজধানীতে সুকীর্তিত ছিল। তাই ঘটনাটি সেই নারীর অহঙ্কার কে যে পুষ্ট করবে সেটা একরকম অবধারিত ছিল।

কারণ, বৈষয়িক মানুষের ভালবাসা প্রধানা রাজনটীর কাছে তিক্ত হয়ে এসেছিল। নটী তাঁর নিজের দৈহিক সৌন্দর্য সম্বন্ধে বিশেষ সচেতন ছিলেন। আর, যে কোন শক্তি যেমন ধর্মজীবন তাঁর সৌন্দর্যকে উপেক্ষা করত সেই দিকেই তিনি আকর্ষণ বোধ করতেন। ইহজগৎ সম্বন্ধে নিতান্ত ক্লান্ত হবার কারণে পবিত্র ধামের দিকে তাঁর আস্থা জন্মেছিল। জো ডো বৌদ্ধ-ধর্ম যা কিনা দৃশ্য জাগতিক সকল সৌন্দর্য সকল উজ্জ্বলতাকে আবর্জনা এবং ক্লেদ বলে অস্বীকার করে থাকে—সেই ধর্মই প্রধানা রাজনটীর মত এক মহিলাকে আকর্ষণ করবে এই ঘটনার মধ্যে যেন একটা অপ্রতিরোধ্য ভবিতব্যতা রয়েছে। এর কারণ হয়ত এই যে রাজ দরবারের বাহ্য, কৃত্রিম চাকচিক্যের মোহ থেকে তাঁর মন সম্পূর্ণ নিরাময় লাভ করেছিল। এই চাকচিক্য, এই উজ্জ্বলতা নির্ভুলভাবে সূচিত করত "আইনের যুগ" এর শেষের দিনগুলিকে আর সেই যুগের অবক্ষয়কে।

প্রেমেই যাদের বিশেষ পারদর্শিতা, তেমন মানুষ জনের মধ্যে প্রধানা রাজনটীর ছিল সম্মানের আসন তাঁকে গণ্য করা হত রাজদরবারে আভি জাত্যের মূর্ত প্রতীক হিসেবে। কোন পুরুষকে তিনি এ পর্যন্ত হৃদয় দান করেননি এই ঘটনার জন্যই ছিল তাঁর বিশেষ খ্যাতি। সম্রাটের প্রতি কর্তব্য

পালন তিনি অবশ্যই করতেন বিলক্ষণ বিনম্রতার সঙ্গে কিন্তু তাই বলে কেউই বিশ্বাস করত না যে সম্রাটকে তিনি অন্তর দিয়ে ভালবাসতেন।

শিগা মন্দিরের প্রধান পরোহিতের সততা ছিল সর্বখ্যাত। রাজধানীতে সকলেই জ্ঞাত ছিল যে এই বষীয়ান সন্ন্যাসী বর্তমান জগৎকে সম্পূর্ণ ভাবেই ত্যাগ করেছেন.। ঠিক সেই কারণেই সকলেই অত্যন্ত আশ্চর্য হয়ে গেল যখন গুজব ছড়ালো যে প্রধানা রাজনটীর সৌন্দর্য তাঁকে মোহিত করেছে যে জন্য তিনি পরকাল পর্যন্ত বিসর্জন দিয়েছেন। পবিত্র ধামের ওপার আনন্দ রাশি ত্যাগ করা—বিশেষ করে যখন তা প্রায় আয়ত্তের মধ্যে এসে পড়েছিল এর চেয়ে বড়ো ত্যাগ, এর চেয়ে শ্রেষ্ঠতর দান আর কিছুই হতে পারেনা।

রাজ দরবারে যে সব যুবা বয়সী লম্পটেরা আর সম্ভ্রান্ত কন্দর্পকান্তি রাজ পুরুষেরা জড়ো হত, প্রধানা রাজনটীর চিত্ত তাদের সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন ছিল। পুরুষের দেহ সৌষ্ঠব তাঁর কাছে এখন মূল্যহীন। তাঁর একটিই ভাবনার বিষয় ছিল কোথায় সেই পুরুষ যে তাঁকে দিতে পারবে প্রবলতম, গভীরতম ভালবাসা। এমনি যার আকাঙ্ক্ষা সে এক ভীষণা নারী। যদি সে সামান্য নটী হয়, তাহলে সে হয়ত পার্থিব সম্পদেই তৃপ্ত হবে। প্রধানা রাজনটী কিন্তু পার্থিব বৈভব যা কিছু দিতে পারে তার সব কিছুই ভোগ করেছেন। যে পুরুষের প্রতীক্ষা তিনি করছিলেন তাকে হতে হবে এমন একজন যিনি তাঁকে দিতে পারবেন পরকালের পরমার্থ।

রাজদরবারে প্রচার হয়ে গেল প্রধান পুরোহিতের মুগ্ধতার গুজব। শেষ পর্যন্ত পরিহাসের ছলে কাহিনীটা পেঁছে গেল সম্রাটের কানে। প্রধানা রাজনটী এই সব চটুল লঘু কথায় আদৌ আরাম পাননি। শীতল, উদাসীন মনোভাব তিনি বজায় রেখেছিলেন। তিনি জানতেন যে দুটি কারণে রাজ সভার মানুষজন এমন একটা নিষিদ্ধ বিষয় নিয়ে নির্ভয়ে রঙ্গ রসিকতা করতে পারছে। কারণ দুটোর একটা হল প্রধান পুরোহিতের প্রেমের উল্লেখ করতে গিয়ে তারা সেই নারীর রূপকেই অভিনন্দিত করছিল যা কিনা এমন খ্যাত-কীর্তি সন্ন্যাসীকেও তার জপ ধ্যান ভুলিয়ে দিতে পেরেছিল। দ্বিতীয় কারণটা

হল এই যে সবাই জানত যে সম্ভ্রান্তা মহিলাটির প্রতি বৃদ্ধের প্রেম কখনোই সার্থকতায় উপনীত হতে পারবে না।

প্রধানা রাজনটী বৃদ্ধ সন্ন্যাসীর মুখখানা স্মরণ করতে চেষ্টা করলেন যাঁকে তিনি গোশকটের বাতায়নের ভেতর থেকে দেখেছিলেন। এতদিন পর্যন্ত যে সব পুরুষ তাঁকে প্রেম নিবেদন করেছে তাদের কারো মুখের সঙ্গে সে মুখের কোন সাদৃশ্য খুঁজে পেলেন না। আশ্চর্যের কথা হল এই যে প্রেম উজ্জীবিত হয়েছে এমন এক মানুষের হৃদয়ে যার মধ্যে ভালবাসতে পারা যায় এমন গুণ বা যোগ্যতাবলীর কণা মাত্র নেই। প্রধানা রাজনটীর মনে উদয় হতে থাকে সেই সব কবিতার পংক্তি যার একটা হল, 'আমার প্রেম ভরসা-হীন, নিঃসঙ্গ একাকী।' রাজপ্রাসাদের মাইনে করা চারণ কবিরা হৃদয়হীনা প্রেমিকার মনে করুণা জাগাবার উদ্দেশ্যে এই সব পংক্তি গেয়ে থাকে। আজ প্রধান পুরোহিতের যে নিঃসহায় অবস্থা তার সঙ্গে তুলনা করলে এই সব সম্ভ্রান্ত প্রেমিকদের অবস্থা ঢের বেশি ভাগ্যশালী বলে বোধ হয়। প্রধানা রাজনটী ভাবছিলেন যে তাদের কাব্য পার্থিব চাপল্যের অভিব্যক্তির অতিরিক্ত কিছু নয় তারা অনুপ্রাণিত আত্মগর্ব থেকে, হৃদয়ের বেদনা থেকে নয়।

এতক্ষণে পাঠকের কাছে স্পষ্ট হয়ে থাকবে যে প্রধানা রাজনটী ঠিক রাজকীয় আভিজাত্যের মূর্ত প্রতীক ছিলেন না, সাধারণ বিশ্বাস যাই হোক না কেন বরং তিনি ছিলেন এমন এক নারী যার কাছে জীবন ধারণের আনন্দই ছিল সেই জ্ঞান যে কারো না কারো ভালবাসা সর্বদাই তার প্রাপ্য। মর্যাদার দিক থেকে যত ওপরেই হোক না কেন প্রাথমিক ভাবে তিনি একজন নারী আর গোটা বিশ্বের ক্ষমতা আর মর্যাদা তুচ্ছ হয়ে যাবে যদি তারা প্রাথমিক বোধ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। তাঁর চেনা জানার বৃত্তের পুরুষ মানুষেরা রাজনৈতিক ক্ষমতা অর্জনের লড়াই-এ হয়ত নিজেদের নিয়োগ করত কিন্তু পৃথিবীটাকে দাবিয়ে রাখার যে স্বপ্ন তিনি দেখতেন তার পদ্ধতিটা কিন্তু ছিল একেবারে ভিন্ন ধরনের, সেগুলি ছিল নারীর বিশেষ পদ্ধতি। তাঁর পরিচিত নারীদের মধ্যে অনেকে মস্তক মুণ্ডন করে ব্যবহারিক জগৎ থেকে

অবসর নিয়েছিলেন। প্রধানা রাজনটীর কাছে সেই সব মহিলারা ছিলেন হাস্যাস্পদ। কেননা, যতই কেন বলুক না যে ব্যবহারিক জগৎকে সম্পূর্ণ ভাবে বিসর্জন দেবে—কোন নারীর পক্ষে সম্ভবপর হয় না সেই সব সম্পদ সম্পূর্ণ করে ত্যাগ করতে যেগুলি তার একান্ত নিজস্ব। তেমন ত্যাগ করতে পারে পুরুষই।

সরোবরের কিনারায় দাঁড়িয়ে থাকা সেই বৃদ্ধ সন্ন্যাসী জীবনের কোন এক পর্যায়ে এসে ত্যাগ করেছিলেন এই প্লবমান পৃথিবীকে তার ক্ষণস্থায়ী সুখ গুলি সহ। প্রধানা রাজনটীর বিবেচনায় তিনি রাজসভায় তাঁর পরিচিত সম্ভ্রান্ত সকল পুরুষের থেকে অনেকাংশে শ্রেষ্ঠ। আর একদা তিনি যেমন এই প্লবমান জগৎকে ত্যাগ করেছিলেন ঠিক তেমনি, এখন কেবল তাঁরই জন্যে, প্রধানা রাজনটীরই জন্যে তাঁর নিজের পরকালও সমর্পণ করতে উদ্যত হয়েছেন।

প্রধানা রাজনটী পবিত্র মণিপদ্মের ধারণা স্মরণে আনেন। তাঁর সুদৃঢ় ধর্ম বিশ্বাস তাঁর মনে এই পদ্মের একটা জীবন্ত ছবি এঁকে নিয়েছিল। তিনি সেই দু'শ পঞ্চাশ যোজন ব্যাসের বিশাল পদ্মের কথা চিন্তা করছিলেন। সেই অসম্ভব বৃহৎ পদ্মলতাতেই যেন তাঁর রুচি স্বস্তি পেত, রাজধানীর পুকুরে পুকুরে ভেসে থাকা শীর্ণ, শুষ্ক পদ্মগুলির বদলে। রাত্রিকালে তিনি যখন শুনতে পেতেন তাঁর উদ্যানের মধ্য দিয়ে শোঁ শোঁ করে বাতাস বয়ে যাচ্ছে তখন সেই শব্দ তাঁর কাছে খুবই পানসে লাগত—পবিত্র ধামের রত্ন বৃক্ষ গুলির ভেতর দিয়ে বয়ে যাওয়া বাতাসের সঙ্গে তুলনায়। যখন তিনি ভাবতেন সেই সব অদ্ভুত বাদ্য যন্ত্রের কথা যেগুলি ঝুলে থাকে আকাশ থেকে আর কারো হাতের স্পর্শ ছাড়াই বেজে ওঠে তখন রাজ প্রাসাদের হর্ম্যে হর্ম্যে মুখরিত বীণার ধ্বনি তাঁর কাছে নিকৃষ্ট অনুকরণ বলেই বোধ হত।

শিগা মন্দিরের প্রধান পুরোহিত যুঝছিলেন। যৌবনে তিনি দেহের সঙ্গে যখন যুদ্ধ করেছিলেন তখন সেই আশাই বরাবর তাঁকে নিমজ্জিত হওয়া থেকে

রক্ষা করত যে পরকালের উত্তরাধিকারটা করায়ত্ত হবে। কিন্তু বার্ধক্যের এই বেপরোয়া সংগ্রামের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে অপূরণীয় ক্ষতির হাহাকার।

আকাশের সূর্যের মত ধ্রুব হল এই সত্য যে প্রধানা রাজনটীর প্রতি এই প্রেম কোন উপায়েই সার্থক হওয়া অসম্ভব—প্রধান পুরোহিত সে কথা জানতেন। সেই সঙ্গে তিনি একথাও খুবই ভালভাবে জানতেন যে যতক্ষণ তিনি এই প্রেমের বন্ধনে আবদ্ধ রয়েছেন পবিত্র ধামের দিকে এক পাও তিনি এগোতে পারবেন না। প্রধান পুরোহিত এতকাল সম্পূর্ণ অনাবিল মন নিয়ে জীবন কাটিয়ে এসেছেন, এক লহমার মধ্যে যেন তিনি অন্ধকারের বেষ্টনীর মধ্যে ধরা পড়ে গেছেন—ভবিষ্যৎ সম্পূর্ণ অনিশ্চিত। যে সাহসে ভর দিয়ে তিনি গোটা যৌবন কালটা সংগ্রাম করতে নির্বিঘ্নে পেরিয়ে এসেছেন সেই সাহসের উদ্ভব হওয়ার মূলে ছিল আত্মবিশ্বাস আর গর্ববোধ। গর্ববোধ এই জন্য যে স্বেচ্ছায় তিনি যে সব সুখ থেকে নিজেকে বঞ্চিত করছেন, অনায়াসে, কেবল ইচ্ছে করলেই সে সব সুখ তাঁরই হতে পারত।

প্রধান পুরোহিতের মনের মধ্যে নতুন করে ভয় ঢুকেছে। শিগা সরোবরের উপান্তে সেই সম্ভ্রান্ত গো-শকট এসে দাঁড়ানোর আগের মুহূর্ত পর্যন্ত তাঁর স্থির বিশ্বাস ছিল যে অচিরে অনায়াসে উপলব্ধ হতে চলেছে নির্বাণের মধ্যে সমাসন্ন মুক্তি। কিন্তু এখন তিনি যেন নতুন করে ঘুম ভেঙে জেগে উঠেছেন বর্তমানের বস্তুজগতের অন্ধকারের মধ্যে। এক পা-এগোলে কী আছে সেটুকুও দেখার উপায় নেই।

যত প্রকারের ধ্যান ছিল সবই হল নিরর্থক। চন্দ্রমল্লিকার ধ্যানে সমাসীন হলেন—ধ্যান করলেন সৃষ্টিকর্তার পূর্ণ স্বরূপের। আবার খণ্ডাংশেও চিত্তনিবেশ করতে যত্নবান হলেন। কিন্তু একাগ্র হতে যতই চেষ্টা করেন নটীর সুন্দর মুখখানি মানস পটে ভেসে ওঠে। জলধ্যানও বৃথা হল, প্রতি-বারই সেই বিকচ আনন সরোবরের মৃদুতরঙ্গের ভেতর থেকে টল-টল করতে থাকে।

নিঃসন্দেহে এর কারণ হল।তাঁর মুগ্ধতার একটা স্বাভাবিক পরিনাম।

অচিরেই সন্ন্যাসী বুঝতে পারলেন যে মনকে সমাহিত করার চেষ্টায় সুফলের থেকে ক্ষতিই বেশি হচ্ছে। তখন তিনি তাঁর চিত্তকে বিমূঢ় করে দেবার প্রয়াসী হলেন তাকে ব্যাপ্ত করে দিয়ে। আশ্চর্য হয়ে তিনি ভাবলেন এক-মুখী করতে গিয়ে বিপরীত প্রতিক্রিয়া কেন হয়, কেন তাঁকে আরো গভীর ভাবে তাঁর মুগ্ধতার কূপে ডুবিয়ে দেয়। কিন্তু শীঘ্রই তাঁর প্রতীতি হল যে বিপরীত প্রক্রিয়ায় চিন্তাকে ব্যাপ্ত করে দেবার অর্থ হল এই যে বাস্তব পক্ষে তিনি এই মুগ্ধতাকে স্বীকার করে নিচ্ছেন। ভারাক্রান্ত চিত্ত যখন সহ্যের সীমায় এসে পৌঁছেচে তখন প্রধান পুরোহিত স্থির করলেন, এই নিষ্ফল সংগ্রাম চালিয়ে যাবার বদলে বোধ হয় পরিত্রাণের প্রয়াস থেকে পলায়নই শ্রেয়তর—প্রধানা রাজনটীর দেহ সৌষ্ঠবের দিকে চিন্তাকে কেন্দ্রীভূত করেই দেখা যাক কী হয়।

সেই নারীটিকে নানান রূপে নানান সজ্জায় কল্পনা করার মধ্য দিয়ে প্রধান পুরোহিত এক নতুন স্বাদের আনন্দ পেলেন। যেন এক বুদ্ধ মূর্তিকে সাজাচ্ছেন পুষ্প মুকুট দিয়ে, সুবর্ণ খচিত চাঁদোয়া খাটিয়ে। এইভাবে তিনি তাঁর প্রেমের বস্তুটিকে এক অধরা, সুদূর দীপ্তিমতী অসম্ভাব্য মূর্তিতে পরিণত করে তুললেন। আর এর ফলে তাঁর প্রাণে বিশেষ আনন্দ জাগতে লাগল। কিন্তু কেন? তাঁর পক্ষে তো প্রধানা রাজনটীকে সাধারণ মানুষের দুর্বলতা দিয়ে গড়া এক অতি সাধারণ স্ত্রীলোক বলে ধারণা করাই স্বাভাবিক ছিল। এইভাবেই তো অন্তত কল্পনায় সেই নারীকে তিনি নিজের কাজে লাগাতে পারতেন।

এই প্রশ্ন নিয়ে ভাবতে ভাবতে একটা সত্য তার কাছে উন্মোচিত হল। মনে মনে তিনি প্রধানা রাজনটীর যে ভাবমূর্তি গড়ছিলেন, সেটা কোন অলীক ছায়াও নয়। বরং সেটা হল সত্যের সকল পদার্থের সারবস্তুর প্রতীক। সেই সার বস্তুকে কোন স্ত্রীলোকের আকৃতির মধ্যে দিয়ে অনুসরণ করা সত্যিই দুরূহ কাজ। তথাপি কেন তিনি এইভাবে অগ্রসর হচ্ছেন তার কারণটাও নাগাল থেকে দূরে নয়। প্রেমে পড়ার কালেও, শিগা মন্দিরের প্রধান

পুরোহিত জীবনভোর প্রশিক্ষণ পাওয়া সেই অভ্যাস বিসর্জন দেননি, যে অভ্যাসের দ্বারা কোন বস্তুর মর্মমূলে পেঁছিবার কালে নিরন্তর তাকে নিয়ে বিমূর্ত ভাবনার সাধনা করে এসেছেন। কিয়োগোকুর প্রধানা রাজনটী এখন তাঁর কাছে দুশ পঞ্চাশ যোজন ব্যাপ্ত বিরাট পদ্মের ভাবমূর্তির সঙ্গে একীভূত হয়ে গেছেন। জলের মধ্যে অসংখ্য পদ্ম পরিবৃত সেই নারী এখন সুমেরু পর্বতের থেকেও বিশাল, একটা গোটা রাজ্যের থেকেও প্রশস্ত।

সন্ন্যাসী তাঁর প্রেমকে যতই আরো দুর্লভ, ধরা ছোঁয়ার অতীত অসম্ভব রূপে কল্পনা করেন ততই গভীরভাবে বুদ্ধের কাছে তিনি অপরাধী হয়ে পড়ছিলেন। কেননা তাঁর প্রেম যতই সম্ভাব্যতা থেকে দূরে চলে যাচ্ছিল ঠিক ততদূরেই চলে যাচ্ছিল তাঁর আত্মজ্ঞান লাভের সম্ভাবনা। যতই তিনি ভাবেন কী অসহায় তাঁর প্রেম, ততই দৃঢ়তর হয় তাঁর মনের মধ্যে সেই প্রেম নিয়ে তাঁর কল্পজগৎ, তাঁর মনের মধ্যে কুচিন্তাগুলিও গভীরতর ভাবে প্রবিষ্ট হয়ে যায় যতক্ষণ তিনি মনে মনে ভাবতেন যে তাঁর প্রেম হয়ত কোন দূরতম উপায়ে সার্থক হলেও হতে পারে ততক্ষণ হয়ত বিপরীত অর্থে তাঁর পক্ষে সম্ভব হত প্রতিনিবৃত্ত হওয়া। কিন্তু প্রধানা রাজনটী এখন ব্যাপ্তি নিতে নিতে এক রূপকথার মত বিশাল সম্পূর্ণ অপ্রাপ্তব্য জীব হয়ে উঠেছে। সন্ন্যাসীর প্রেম এখন হয়ে উঠেছে এক নিস্তরঙ্গ বিশাল সরোবর—দৃঢ়ভাবে জোর করে ঢেকে দিয়েছে বিশ্বের উপরিতল।

তাঁর আশা ছিল যদি কোন উপায়ে আর একবার সেই নারীর মুখখানি দেখতে পান। আবার ভয় হত মুখোমুখি হলে সেই দেহযষ্ঠি যা এখন বিশাল পদ্মে পরিণত হয়েছে, সেটা হয়ত চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে সম্পূর্ণ বিলীন হয়ে যাবে। তাই যদি ঘটে তাহলে নিঃসন্দেহে তিনি নিজে পরিত্রাণ পেয়ে যাবেন। সত্যই, এবার তিনি আত্মোপলব্ধি অর্জন করতে চলেছেন। আর সেই সম্ভাবনার কথা স্মরণ হওয়া মাত্র সন্ন্যাসী ভীত, ত্রস্ত হয়ে পড়েন।

সন্ন্যাসীর গোপন প্রেম এইভাবে নানান আত্মপ্রতারণার রূপ পরিগ্রহ করে চলল। আর, শেষ পর্যন্ত যখন তিনি স্থির করলেন যে সেই নারীকে

তিনি দেখতে যাবেন তখন তিনি সেই ভ্রান্ত বিশ্বাসের কবলে পড়েছেন যে সেই ব্যাধি থেকে তিনি প্রায় সম্পূর্ণ নিরাময় লাভ করেছেন, যে ব্যাধি তাঁর দেহকে এতদিন প্রায় জ্বালিয়ে পুড়িয়ে খাক করে দিচ্ছিল। মোহগ্রস্ত সন্ন্যাসীর এমন বিশ্বাসও জন্মালো যে এই যে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ফলে চিত্তে যে আনন্দের উপলব্ধি হচ্ছে সেটা হল তাঁর প্রেমের দরুণ যে বন্ধন তাঁকে পীড়িত করছিল তার থেকে মুক্তি লাভজনিত প্রসন্নতা।

প্রধানা রাজনটীর গৃহের কারোরই মনে অস্বাভাবিক ঠেকেনি উদ্যানের এক কোণে এক বৃদ্ধ সন্ন্যাসীকে লাঠিতে ভর দিয়ে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে বিষণ্ণ মুখে একদৃষ্টিতে সেই গৃহের দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখে। সাধু, সন্ত, প্রার্থী আর ভিক্ষুকেরা রাজধানীর প্রসাদগুলির বাইরে ভিক্ষার আশায় প্রায়ই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করে থাকে। একজন পরিচারিকা তার গৃহস্বামিনীকে খবরটা দিয়েছিল। প্রধানা রাজনটী অন্য মনে একবার চিকের আড়াল থেকে উদ্যানের দিকে তাকিয়ে দেখেছিলেন। দেখলেন নবীন পত্ররাজির ছায়ায় বিবর্ণ কালো রঙের আলখাল্লা পরিহিত এক বিশুষ্ক বৃদ্ধ সন্ন্যাসী নতমস্তকে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। কিছুক্ষণ ধরে নটী তাঁকে লক্ষ করে দেখলেন। বুঝলেন যে সন্দেহাতীত ভাবে ইনিই সেই সন্ন্যাসী, শিগার সরোবরের ধারে যাঁকে তিনি দেখেছিলেন। নটীর পাণ্ডুর মুখমণ্ডল আরো বিবর্ণ হয়ে গেল।

কয়েক মুহূর্তের দ্বিধার পরে তিনি আদেশ দিলেন যে উদ্যানে সন্ন্যাসীর উপস্থিতিটাকে যেন উপেক্ষা করা হয়। পরিচারিকারা মাথা নুইয়ে চলে গেল।

এই সর্বপ্রথম নটী অস্বস্তির শিকার হলেন। বয়সকালে তিনি বহু লোককে দেখেছেন ইহকালের সব কিছু উজাড় করে খুইয়ে ফেলতে, কিন্তু এমন কারোকে এ পর্যন্ত দেখেননি যে কিনা পরকাল এইভাবে হারাচ্ছে। দৃশ্যটা অবর্ণনীয়ভাবে দুর্লক্ষণের আর ভীতিপ্রদ। সন্ন্যাসীর প্রেমের কথা

চিন্তা করে কল্পনায় সেসব আনন্দের চিত্র রচনা করেছিলেন তারা এক বিদ্যুৎ চমকের মত মিলিয়ে গেল। সন্ন্যাসী হয়ত তাঁর সমস্ত ভবিষ্যৎ, তাঁর পরকাল খোয়াচ্ছেন তাঁরই জন্যে কিন্তু তার মানে এই নয় যে সেই পরকালের সম্পদ সব নটীর হাতের মুঠোর মধ্যে আসছে।

প্রধানা রাজনটী নিজের পরিধানের সুরম্য বস্ত্রাদি আর সুগঠিত হাতের দিকে তাকিয়ে দেখলেন। তারপর উদ্যান পেরিয়ে দৃষ্টি মেলে দিলেন বৃদ্ধ সন্ন্যাসীর অসুন্দর জীর্ণদেহ আর বিবর্ণ আলখাল্লার দিকে। কী যেন একটা রয়েছে এই বিচিত্র ঘটনার মধ্যে—এই দুই সম্পূর্ণ বিষম অভিব্যক্তির মধ্যে, এই ভীতি জাগানো যোগাযোগের মধ্যে।

কিন্তু কল্পনায় কত অপূর্ব মনে হয়েছিল সেই ভাবমূর্তি। প্রধান পুরোহিতকে এখন মনে হচ্ছে যেন নরক থেকে হামাগুড়ি দিয়ে উঠে আসা কোন আকৃতি। সেই শুচিস্নিগ্ধ পবিত্র ব্যক্তিত্বের সব চিহ্নই যেন অবলুপ্ত হয়ে গেছে—পবিত্রধামের জোতির্বলয় যেন মিলিয়ে গেছে তাঁর মাথার পিছন থেকে। তাঁর দেহের অভ্যন্তর থেকে যে উজ্জ্বলতা ঠিকরে বেরোত, মনে পড়িয়ে দিত পবিত্রধামের মহিমার কথা, সে সব একেবারে অন্তর্হিত হয়ে গেছে। নিঃসন্দেহে ইনি সেই ব্যক্তি যিনি শিগা সরোবরের ধারে দাঁড়িয়েছিলেন কিন্তু একই সঙ্গে মনে হচ্ছে সেই মানুষের থেকে কতই আলাদা।

রাজ দরবারের প্রায় সকল মানুষের মতই প্রধানা রাজনটী—নিজের হৃদয়ের ভাবগুলিকে গোপন রাখতে চেষ্টা করতেন বিশেষত এমন একটা ব্যাপারে যেটা নিঃসন্দেহে তাঁকে গভীরভাবে প্রভাবিত করবে বলেই ধারণা করা যেত। বৃদ্ধ সন্ন্যাসীর প্রেমের এই সাক্ষ্য প্রমাণ চোখের সামনে দেখে তাঁর হৃদয়টা দমে গেল। এই ভেবে যে এত বছর ধরে যে উন্দাম প্রেমের স্বপ্ন দেখে আসছেন সেই প্রেম যার মধ্যে দিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে তার চেহারাখানা এমনই নৈরাশ্যজনক।

লাঠিতে ভর দিয়ে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে প্রধান পুরোহিত যখন শেষ পর্যন্ত রাজধানীতে এসে পেঁাছেছিলেন, পথের ক্লান্তির কথা তাঁর মনেই ছিল না।

কিয়োগোকুতে প্রধানা রাজনটীর উদ্যানে তিনি অতি সঙ্গোপনে এসে পৌঁছলেন—উদ্যানের অপরপ্রান্তে তাকিয়ে রইলেন। চিকের পর্দার ওপারে রয়েছেন তাঁর প্রেমের নায়িকা সেই মহিয়সী নারী—সন্ন্যাসীর মনে হয়েছিল।

তাঁর আরাধনা এমনি নিষ্কলঙ্ক রূপ পরিগ্রহ করলে পরে সন্ন্যাসীর মনে পরকাল আবার তার রূপ-বৈভব নিয়ে উদিত হতে শুরু করেছিল। এর আগে পবিত্রধামকে এমন নিষ্কলঙ্ক, তীব্র ধারণা নিয়ে কখনো তিনি ধ্যান করেননি। তাঁর জীবনে বাকি রয়েছে শুধু একটি কাজ—প্রধানা রাজনটীর সমক্ষে একবার আনুষ্ঠানিকভাবে হাজির হওয়া। তাঁর প্রেমের কথা ঘোষণা করা আর এইভাবে সেইসব অশুচি চিন্তা থেকে চিরকালের জন্যে মুক্তি পাওয়া—যে সব চিন্তা তাঁর এখনো অনারব্ধ রয়েছে।

জীর্ণ শরীরটাকে লাঠির ওপর ভর দিয়ে রেখে দাঁড়িয়ে থাকা সন্ন্যাসীর পক্ষে বেশ কষ্টকর। মে মাসের প্রখর সূর্যের রশ্মিগুলি গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে তীরের ফলার মত তাঁর মুন্ডিত মাথার ওপর বিঁধছিল। কতবার তাঁর মনে হচ্ছিল এই বুঝি সংজ্ঞা হারিয়ে পড়ে যাবেন। আর লাঠি না থাকলে সত্যি পড়ে যেতেন। সেই নারী যদি হৃদয়ঙ্গম করে কী অবস্থায় তিনি রয়েছেন, আর তার সমক্ষে যাবার আমন্ত্রণ জানায় তাহলে ঔপচারিক অনুষ্ঠানটা শেষ হয়ে যেতে পারত। প্রধান পুরোহিত তাই অপেক্ষা করতে থাকেন। প্রতীক্ষা করতে থাকেন বর্ধমান অবসাদে ভেঙে পড়া শরীরের ভার লাঠির ওপর রেখে। সন্ধ্যার মেঘ একসময় সূর্যকে ঢেকে দেয়। প্রদোষের অন্ধকার ঘনিয়ে আসে। প্রধানা রাজনটীর তরফ থেকে কোন বার্তা এসে পৌঁছয় না। সেই মহিলা জানত না যে সন্ন্যাসীর দৃষ্টি তাঁকে ভেদ করে যাচ্ছে, দূরে, পবিত্রধামের অভিমুখে। কতবার চিকের ভেতর থেকে তিনি তাকিয়ে দেখলেন। সন্ন্যাসীর দাঁড়িয়ে রয়েছেন অনড় পাথরের মূর্তির মত। গোধূলির আলোয় উদ্যান দীপ্ত হয়ে ওঠে। তখনো বৃদ্ধ ঠায় দাঁড়িয়ে।

প্রধানা রাজনটী ভয় পেলেন। তাঁর মনে হল উদ্যানে তিনি যা দেখছেন সেটা হল সূত্রে তিনি যেমন পড়েছেন তাই। "অন্তরে গভীরভাবে অনুপ্রবিষ্ট



মায়ার" মূর্ত স্বরূপ। এমন শ্রদ্ধাভাজন মহৎ এক সন্ন্যাসীকে এই যে তিনি পথভ্রষ্ট করেছেন এর ফলে পবিত্রধামতো দূরের কথা নরকেই তাঁর জায়গা পাকা হচ্ছে। নরকের বিভীষিকাগুলির কথা বিশদভাবে তাঁর জানা আছে। তিনি দেখে এসেছেন এতকাল সেই স্বপ্ন ভেঙে গেছে। তিনি জানতেন যেমন তেমন কারোকে ভালবাসার অর্থ নির্ঘাত অধোগতি। সন্ন্যাসীর ভালবাসা যেমন তাঁকে অতিক্রম করে ধেয়ে চলেছিল পবিত্র ধামের দিকে, প্রধান রাজনটী তেমন পুরোহিতকে অতিক্রম করে দেখতে পাচ্ছিলেন নরকের দেবতার ভীতিকর রাজ্যপাট।

তথাপি কিয়োগোকুর এই উদ্ধত পুরবালার অহঙ্কার ছিল উদগ্র। বিনা যুদ্ধে আত্মসমর্পণ তাঁর কুলুজিতে লেখেনি। তখন তাই তাঁর অন্তরস্থ হৃদয়হীনতার সবটাই কাজে লাগালেন। নিজের মনে মনে বললেন বৃদ্ধ সন্ন্যাসী মাথা ঘুরে পড়ে তো যাবেই, আজ না হয় কাল। চিকের ফাঁক দিয়ে ঠাওর করে দেখলেন এতক্ষণে নিশ্চয় পড়ে গেছে। বিরক্ত হয়ে আবার তাকালেন। সেই নিঃশব্দ আকৃতি নিশ্চল ভাবে তখনো দাঁড়িয়ে রয়েছে।

রাত নামে। চাঁদের আলোতে সন্ন্যাসীকে দেখাচ্ছিল যেন একরাশ চাখড়ির মত শাদা হাড়গোড়ের স্তূপ।

ভয়ে রাজনটী নিদ্রা যেতে পারেন না। চিক ফাঁক করে দেখার আর ভরসা নেই। উদ্যানের দিকে পৃষ্ঠ প্রদর্শনই ভালো। কিন্তু নিরন্তর তাঁর মনে হচ্ছিল সন্ন্যাসীর সর্বভেদী দৃষ্টি তাঁর পিঠের ওপর যেন টের পাচ্ছেন।

তিনি জানতেন যে এ কোন মামুলি ভালবাসা নয়। প্রেমে লিপ্ত হবার ভয় থেকে, নরকে পতিত থাকার ভয় থেকে, রাজনটী আরো একান্ত ভাবে উপাসনা করে চললেন পবিত্রধাম পাবার আকাঙ্ক্ষায়।

সে পবিত্রধাম তাঁর নিজের একান্ত—সে পবিত্রধাম তাঁর নিজের হৃদয়ের গভীরে লুকানো ছিল বাইরের ঘাত প্রতিঘাতের স্পর্শশূন্য হয়ে। সন্ন্যাসীর আরাধনার পবিত্রধাম থেকে স্বতন্ত্র—সন্ন্যাসীর প্রেমের সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক নেই। রাজনটীর স্থির বিশ্বাস ছিল সন্ন্যাসীর কাছে তাঁর আরাধ্য পবিত্র-

ধামের প্রকাশ করে ফেললেই সেই ধামের অস্তিত্ব আর থাকবে না—মুহূর্তের মধ্যে চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যাবে।

নিজেকে বোঝালেন যে সন্ন্যাসীর প্রেমের সঙ্গে তাঁর কোন সম্বন্ধই নেই। সেটা এক তরফা ব্যাপার, তাঁর নিজের হৃদয়ের অনুভূতিগুলির কোন যোগ নেই সেই প্রেমের সঙ্গে। তাই পবিত্রধামে স্থান পেতে কোন অন্তরায় হবার কথা নয়। সন্ন্যাসী প্রতীক্ষা করতে করতে মাথা ঘুরে পড়ে যদি মারাও যান, রাজনটী থাকবেন অকলঙ্কিতা। কিন্তু রাত্রি যত বাড়ে, বাতাস যত শীতল হতে থাকে রাজনটীর নিজের পরে বিশ্বাস যেন তাঁকে ছেড়ে পালাতে চায়।

সন্ন্যাসী উদ্যানে দাঁড়িয়েই রইলেন। চাঁদ মেঘের আড়ালে চলে গেলে তাঁকে দেখাচ্ছিল যেন গাঁঠ-সর্বস্ব এক প্রাচীন বৃক্ষের মত।

ওই যে আকৃতিটা বাইরে দাঁড়িয়ে আছে আমার সঙ্গে ওর কোন সম্পর্কই তো নেই, নটী ভাবতে থাকেন। বেদনায় প্রায় তিনি দিশাহারা। ভাবনাগুলো তাঁর বুকের ভেতরের গমগম করছিল, 'হে ঈশ্বর, কেন এমন ঘটলো?'

আশ্চর্যের কথা, সেই মুহূর্তে প্রধানা রাজনটী কিন্তু তার দৈহিক সৌন্দর্যের কথা সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়ে গেছেন। কিংবা আরেকটু সঠিকভাবে বলতে গেলে বলা যায় যে নিজের চেষ্টায় তিনি সেটা ভুলতে সক্ষম হয়েছিলেন।

তারপর একসময় অন্ধকার ভেদ করে ক্ষীণ শুভ্র আলোর রেশ দেখা দিতে থাকে। প্রত্যুষের আলো আঁধারির ভেতর থেকে সন্ন্যাসীর আকৃতিটা ফুটে ওঠে। তিনি তখনো দাঁড়িয়ে আছেন। প্রধানা রাজনটী হার মানলেন। একজন পরিচারিকাকে আদেশ দিলেন বৃদ্ধ সন্ন্যাসীকে আমন্ত্রণ করে উদ্যান থেকে ভেতরে ডেকে নিয়ে আসতে। চিকের বাইরে তিনি যেন নতজানু হয়ে অপেক্ষা করেন।

সন্ন্যাসী তখন অবলুপ্তির সেই সীমায় পৌঁছে গেছেন রক্ত মাংসের শরীর যখন বিলীন হয়ে যাবার কিনারায় এসে যায়। তখন তার আর স্মরণ নেই

প্রতীক্ষা করছেন প্রধানা রাজনটীর, না কি পরকালের। যদিও দেখলেন যে একজন পরিচারিকা মহলের ভেতরে থেকে উদ্যানে আসছে, কিন্তু তাঁর ধারণায় আসে নি যে যেজন্য প্রতীক্ষা করছেন শেষ পর্যন্ত তা তাঁর করায়াত্ত।

পরিচারিকা কর্ত্রীর বক্তব্য শুনিয়ে গেল। তার কথা শেষ হলে সন্ন্যাসীর কণ্ঠ থেকে এক আর্তনাদ উঠল, ভীতিপ্রদ, অমানুষিক এক আর্তনাদ। পরিচারিকা হাত ধরে তাঁর পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবার চেষ্টা করল কিন্তু তিনি সরে গেলেন, নিজেই চলতে শুরু করলেন হর্ম্যের দিকে দৃঢ় দ্রুত পদক্ষেপে।

চিকের অপর দিকটা অন্ধকার। বাইরে থেকে রাজনটীর আকৃতিটা চেনা যায় না। সন্ন্যাসী নতজানু হয়ে বসেছিলেন। দুহাতে মুখ ঢেকে তিনি কাঁদছিলেন। দীর্ঘকাল তিনি ওই ভাবেই রইলেন। কোন কথা বলেন নি। তাঁর দেহ মৃগীরোগীর মত কাঁপছিল।

তারপর প্রত্যুষের অন্ধকারের ভেতর থেকে নামিয়ে রাখা চিকের পর্দা ভেদ করে একখানি দুগ্ধ-শুভ্র হাত বেরিয়ে আসে।

শিগা মন্দিরের প্রধান পুরোহিত সেই হাত নিজের দুই হাতের মধ্যে নিয়ে কপালে আর গালে চেপে ধরলেন।

কিয়োগোকুর প্রধানা রাজনটী টের পেলেন এক অপরিচিত শীতল হাত তাঁর হাত স্পর্শ করেছে। সেই সঙ্গে উষ্ণ আর্দ্রতাও তিনি টের পেলেন। কোন একজনের অশ্রু তাঁর হাতকে সিক্ত করছে। চিকের ভেতর দিয়ে প্রভাতের পাংশু আলোর রশ্মিগুলি যখন তাঁর দেহের ওপর এসে পড়ছিল তখন কী করে যেন সেই নারীর উগ্র ধর্ম চেতনা সম্পৃক্ত হয়ে যাচ্ছিল এক অত্যাশ্চর্য অনুপ্রাণনা নিয়ে। দ্বিধাশূন্যভাবে তিনি বুঝলেন যে অপরিচিত যে হাত তাঁকে স্পর্শ করেছে অসংশয়ে সে হাত ভগবান বুদ্ধের।

সেই নারীর অন্তরে তখন নতুন করে উদিত হল এক মহাভাব। পবিত্রধামের পান্না দিয়ে গড়া ভূমি, সপ্ত মাণিক্য দিয়ে খচিত লক্ষ লক্ষ স্তম্ভ, গীতরত দেবদূতের দল, রূপোর বালু দিয়ে ঘেরা সুবর্ণের পুষ্করিণীগুলি দীপ্তিময় পদ্মপুষ্প আর কলাবিঙ্কদের সুমিষ্ট সুরলহরী—নতুন করে যেন

সৃষ্টি হচ্ছিল। এই যদি সেই পবিত্র ধাম হয় যাতে তিনি লব্ধ কাম হবেন বলেই তাঁর বিশ্বাস তাহলে প্রধান পুরোহিতের প্রেম স্বীকার করতে কিসের বাধা ?

তিনি অপেক্ষা করতে থাকেন। বুদ্ধের হাত দিয়ে যিনি তাঁকে স্পর্শ করেছেন সেই মহাপুরুষ তাঁকে আদেশ করুন দুজনের মধ্যে চিকের বিভেদ প্রাচীরটা উঠিয়ে নিতে। অচিরেই তিনি সেই আদেশ করবেন। আর তারপর পর্দা সরিয়ে তিনি তাঁর অতুলনীয় রূপ লাবণ্যের পশরা নিয়ে সন্ন্যাসীর সামনে দাঁড়াবেন সেই শিগা সরোবরের প্রান্তে সে দিনের মত। তারপর তিনি সন্ন্যাসীকে নিয়ে যাবেন গৃহের ভেতরে।

প্রধানা রাজনটী অপেক্ষা করতে থাকেন।

কিন্তু শিগা মন্দিরের প্রধান পুরোহিত কোন কথাই উচ্চারণ করলেন না। তিনি রাজনটীর কাছে কোন কিছু প্রার্থনা করলেন না। অল্প সময় পরে তাঁর হাতের মুঠি আলগা হয়ে গেল। নটীর হিমানী শুভ্র হাত প্রত্যুষের আলোয় পরিত্যক্ত হল। সন্ন্যাসী চলে গেলেন।

প্রধানা রাজনটীর অন্তরটা আবার শীতল হয়ে গেল।

কয়েকদিন পরে রাজ দরবারে একটা গুজব শোনা গেল যে প্রধান পুরোহিতের আত্মা পরিনির্বাণ লাভ করেছে, শিগাতে তাঁর নিজের প্রকোষ্ঠে। খবরটা শুনে কিয়োগোকুর প্রধানা রাজনটী তাঁর মুক্তোর মত হস্তলিপিতে সূত্র থেকে নকল করে চললেন পুঁথির পর পুঁথি।

পরিচিতি : মিশিমা ইয়ুকিও

মিশিমা ইয়ুকিও-র জন্ম 1925 সালে। 1947 সালে টোকিও বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক উপাধি লাভ করে কিছুকাল অর্থ মন্ত্রকে কাজ করেন। তারপর লেখাতেই সম্পূর্ণ আত্মনিয়োগ করেন। তার আগেই 1944 সালে

তাঁর প্রথম গ্রন্থ 'দ ফ্লাওয়ারিং গ্রোভ' প্রকাশিত হয়েছিল। এই রচনাতে পরিণতি ও প্রতিভার ছাপ পাওয়া যায়। 1949 সালে প্রকাশিত হয়, 'কনফেশনস অফ এ মাস্ক'। সমালোচকদের স্বীকৃতি পায় এই গ্রন্থ। জনপ্রিয়তা আসে তরুণ বর্গের পাঠকদের কাছে। এক তরুণ মনের যৌনতার উন্মেষ খুবই সংবেদনা নিয়ে বিধৃত এই গ্রন্থ। সমকামিতার সমস্যা নিয়ে আরো দুটি উপন্যাস লিখেছেন। শক্তিশালী লেখকের রচনা বিভিন্ন ধারায় এর পর ব্যাপ্তি পেয়েছে। 'দ থার্স্ট ফর লভ' (1951) এক বিশুষ্ক, নীতি বির্হগত গৃহস্থালীর মধ্যে প্রেমের জন্যে বুভুক্ষিত এক ভাবপ্রবণ নারীর শেষ পর্যন্ত নরহত্যায় প্রবৃত্ত হওয়ার কাহিনী। এছাড়া 'দ সাউন্ড অফ ওয়েভস' এক রূপকথার মত প্রেমের কাহিনী—জাপানের এক ছোট দ্বীপের এক জেলের ছেলে ও ছোট একটি মেয়েকে নিয়ে। আবার 'দ টেম্পল অফ দ গোলডেন প্যাভিলিয়ন' গ্রন্থে এক নবীন ব্রতধারী সন্ন্যাসীর মন্দির নিয়ে উজাড় করে দেওয়া ভক্তিরস শেষ পর্যন্ত তাকে ক্ষিপ্ত করে তুলেছে সেই মন্দিরকে জ্বালিয়ে দিতে।

প্রাচীন নোহ ও কাবুকি নাটকও এরপর অনেক লিখেছেন মিশিমা। অন্তত বারোখানি উপন্যাস, গল্প ও কবিতার সংগ্রহ প্রায় পঞ্চাশ বা ততোধিক —মিশিমার গুণগ্রাহীরাই বলেন যে এত বেশি লেখার জন্যে সব লেখাতে সমান স্তরের গুণমান বজায় থাকেনি।

অলঙ্কার প্রীতি ও দুর্বোধ্যতা মিশিমার লেখার স্টাইলকে অনুবাদকের পক্ষে দুরূহ করেছে তেমনি তরুণ পাঠকদের সমর্থনও পেয়েছেন এই দুইটি বৈশিষ্ট্যের কারণে।

'দ প্রিস্ট অ্যান্ড হিস লভ' প্রথম প্রকাশিত হয় 1954 সালে। চতুর্দশ শতাব্দীর যুদ্ধ সম্বন্ধীয় ইতিহাসের একটি খন্ডে এই আখ্যানের সংক্ষিপ্ত উল্লেখ থেকে একে উদ্ধার করেছেন মিশিমা। জাগতিক প্রেম আর ধর্ম-বিশ্বাসের মধ্যে বিরোধকে কাহিনীর বিষয় হিসেবে গ্রহণ করার রেওয়াজ পশ্চিমী সাহিত্যে যত পাওয়া যায় প্রাচ্য ভাবনায় নাকি ততটা নয়। জোডো বা 'পবিত্র ধাম', বৌদ্ধ ধর্ম বিশ্বাসের একটি শাখা—দ্বাদশ শতাব্দীতে হোনেজ শোনিজ-এর

দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়। তার আগে জোডো মতের পূর্বসূরী এশিন (942-1017 খৃ) ওজো ইয়োশু বা 'মুক্তির উপায়' গ্রন্থে জ্যোডো ধর্ম বিশ্বাসে গৃহীত আচার ধারা একীকৃত করেছিলেন। এশিন-এর মতানুসারে অমিতাভ বুদ্ধের নাম জপ করতে করতে যখন আত্মোপলব্ধি আসে তখন পবিত্রধাম জাপকের আয়ত্ত হয়। পবিত্র ধামের বৈভবাদি এই গল্পের শুরুতে এবং দুই প্রধান চরিত্রের ধ্যানধারণাতে চমৎকার রূপ ও তাৎপর্য পেয়েছে।



অন্বেষার অন্যান্য বই

হাইনরিষ ব্যোলের নির্বাচিত কাহিনী
ভাষান্তর ॥ নীহার ভট্টাচার্য

আত্মকথা ॥ কৃষণচন্দর
ভাষান্তর ॥ জয়া মিত্র

আর্স্কিন কণ্ডওয়েলের নির্বাচিত গল্প
সম্পাদনা ॥ সব্যসাচী দেব

সাদাত হোসেন মাণ্টোর নির্বাচিত গল্প
ভাষান্তর ॥ জয়া মিত্র

ফয়েজ আহমদ ফয়েজ-এর কবিতা
অমিতাভ দাশগুপ্ত

অন্য স্বর ॥ অরুণ মিত্র

অন্বেষা । কলকাতা
৮৯ এ, এন কে ঘোষাল রোড
কলকাতা ৭০০ ০৪২